

পরিচয়

মাঘ ১৩৬৯

য়

প্রচ্ছদ

পরিতোষ সেন

সম্পাদক

গোপাল হালদার । মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

সত্য গুপ্ত কর্তৃক নাথ ব্রাদার্স প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৬ চালতাবাগান লেন, কলকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত ও ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত।



ম্যাডোনা — করুণা সাহা

বিবেকানন্দের রাজনৈতিক চিন্তা

নিশীথ কর

উনিশ ও বিশ শতকের যুগসন্ধিক্ষণে বিবেকানন্দের মৃত্যু ঘটে গেল। উনিশ শতকের শেষ দশকে এই তেজস্বী ব্যক্তিত্বের যে ক্রমবিবর্তন ঘটছিল তার তাৎপর্য স্পষ্টতই রাজনৈতিক হয়ে উঠেছিল। প্রথমবার পাশ্চাত্য দেশ পরিভ্রমণের পর তাঁর 'কলম্বো থেকে আলমোড়া পর্যন্ত' যে বক্তৃতামালার সঙ্কলন তাতে দেখি তাঁর আধ্যাত্মিক চেতনা রাজনৈতিক রূপ নিচ্ছে, আর দ্বিতীয়বার পাশ্চাত্য দেশ ভ্রমণের পর তাঁর বক্তৃতায় দেখি তাঁর মন যেন গণচেতনায় আরও উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠছে। একটু বিশ্লেষণে মনে হয় আমাদের জাতীয় আন্দোলনে বিবেকানন্দের দুটি বিশিষ্ট অবদান হলো: দেশাত্মবোধের 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত' মন্ত্র ও সমাজের নিম্নশ্রেণীর প্রতি সেই 'মন্ত্রে'র আবেদন। তাঁর বাণীর আবেদন সেদিনকার তরুণ মনে আলোড়ন জাগিয়েছিল। শুধু তাই নয়, পরবর্তীকালে বাংলার জাতীয় আন্দোলন যখন সন্ত্রাসবাদী রূপ নিল, তখন বিবেকানন্দের বাণী সেই তরুণ মনে প্রেরণার অন্যতম উৎস বলে গণ্য হয়েছিল। অবশ্য এই সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন সম্পর্কে ঐতিহাসিক বিচারে আমাদের মত-পার্থক্য থাকতে পারে। কিন্তু সে যাই হোক, সে-আন্দোলনে বিবেকানন্দের প্রভাব অনস্বীকার্য। এ সম্বন্ধে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য। অবশ্য সুভাষচন্দ্রের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের রাজনীতির সঙ্গেও মতপার্থক্যের অবকাশ থাকতে পারে। কিন্তু বাংলার সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের তিনি ছিলেন অন্যতম অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা। তিনি বলেছিলেন: "যদিও স্বামিজী নিজে কোনও রাজনৈতিক বাণী দেন নি, তবুও যাঁরা তাঁর ও তাঁর রচনাবলীর সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে স্বদেশপ্রেমের মনোভাব গড়ে উঠেছিল। অন্তত

পক্ষে যতদূর পর্যন্ত বাংলা দেশের সম্পর্কে সেই ব্যাপারে বলা যায় স্বামী বিবেকানন্দ ভারতের জাতীয় আন্দোলনের আধ্যাত্মিক পিতা।”

এখানে 'আধ্যাত্মিক পিতা', এ কথা বলার অর্থ—বিবেকানন্দ প্রচলিত অর্থে রাজনৈতিক ছিলেন না বা রাজনৈতিক বাণীও দেন নি। তবে তাঁর বিশেষ ধরণের আধ্যাত্মিকতা থেকেই তাঁর রাজনীতি উৎসারিত হয়েছিল বলে তিনি 'আধ্যাত্মিক পিতা'। তাই তাঁর আধ্যাত্মিকতার তাৎপর্যটি হৃদয়ঙ্গম করা দরকার।

সমসাময়িক মামুলি রাজনীতির প্রতি বিবেকানন্দের কোনো শ্রদ্ধা ছিল না। তার কারণ দুটি। প্রথম, তিনি তখনকার রাজনৈতিকদের দেশের জন্য আত্মত্যাগের, নিষ্ঠায় ও তাদের দেশাত্মবোধের গভীরতায় বিশ্বাস করতেন না। অবশ্য এ কথা সকলের পক্ষে প্রযোজ্য না হতেও পারে। দ্বিতীয়, তখনকার রাজনৈতিকদের চিন্তার গণ্ডী ছিল শুধু ইংরেজি-শিক্ষিত উচ্চশ্রেণীর মধ্যেই নিবদ্ধ। এ কথা আবার তিনি তখনকার সমাজ সংস্কারকদের সম্বন্ধেও সত্য বলে মনে করতেন। কোটি কোটি অজ্ঞ, দরিদ্র ভারতবাসীর জন্য এঁদের রাজনীতি বা সমাজসংস্কার ছিল না। বিবেকানন্দ বিশ্বধর্ম সম্মেলনে যোগদানের পর ইওরোপ আমেরিকা ঘুরে ১৮৯৭ সালে যখন মাদ্রাজে ফিরে এলেন তখন তিনি তাঁর “আমার সমরনীতি” নামক বক্তৃতায় বললেন:

“লোকে স্বদেশ হিতৈষিতার কথা বলিয়া থাকে। আমিও স্বদেশের হিতসাধনে বিশ্বাসী এবং সে সম্বন্ধে আমারও একটি আদর্শ আছে।...হে ভাবী সংস্কারকগণ, স্বদেশহিতৈষিগণ, তোমরা কি প্রাণে প্রাণে বুঝিতেছ যে কোটি কোটি দেবঋষির বংশধরগণ পশুপ্রায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে? তোমরা কি প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতেছ যে, কোটি কোটি লোক অনাহারে মরিতেছে এবং কোটি কোটি লোক শত শত শতাব্দী ধরিয়া অর্দ্ধাশনে কাটাইতেছে? তোমরা কি প্রাণে প্রাণে বুঝিতেছ যে, অজ্ঞানের কৃষ্ণমেঘ সমগ্র ভারত গগনকে আচ্ছন্ন করিয়াছে? তোমরা কি এই সকল ভাবিয়া অস্থির হইয়াছ? এই ভাবনায় নিদ্রা কি তোমাদের পরিত্যাগ করিয়াছে? এই ভাবনা কি তোমাদের রক্তের সহিত মিশিয়া শিরায় শিরায় প্রবাহিত হইতেছে? দেশের দুর্দশার চিন্তা কি তোমাদের একমাত্র ধ্যানের বিষয় হইয়াছে এবং ঐ চিন্তায় বিভোর হইয়া তোমরা কি তোমাদের নামযশ স্ত্রীপুত্র, বিষয় সম্পত্তি এমন কি শরীর পর্যন্ত ভুলিয়াছ? তোমাদের এরূপ হইয়াছে কি? যদি হইয়া থাকে, তাহা

হইলে তোমরা স্বদেশহিতৈষী হইবার প্রথম সোপানে মাত্র পদার্পণ করিয়াছ। তোমরা অনেকেই জান, আমি ধর্ম-মহাসভার জন্য আমেরিকা যাই নাই, দেশের জনসাধারণের দুর্দশার প্রতিকারের জন্য আমার ঘাড়ে যেন একটা ভুত চাপিয়াছিল। আমি অনেক বর্ষ ধরিয়া সমগ্র ভারতবর্ষে ঘুরিয়াছি, কিন্তু আমার স্বদেশবাসীর জন্য কার্য করিবার কোনো সুযোগ পাই নাই। সেই জন্যই আমি আমেরিকা গিয়াছিলাম। ধর্ম-মহাসভা লইয়া কে মাথা ঘামায়? এখানে আমার নিজের রক্তমাংস স্বরূপ জনসাধারণ দিন দিন ডুবিতেছে তাহার খবর নেয় কে?”

বিবেকানন্দের এই দেশাত্মবোধের ধ্যানধারনা সম্বন্ধে সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার তাঁর মৃত্যুর কয়েক বছর পূর্বে 'স্বামিজী ও দেশাত্মবোধ' নামক প্রবন্ধে বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করে বলেছেন: “যে ঐতিহাসিক কারণ ও ঘটনা-পরম্পরা হইতে ইউরোপে ন্যাশানালিজম, পেট্রিয়টিজম প্রভৃতি শব্দ দ্বারা সমাজের একটা সম্মিলিত অভিপ্রায় প্রকাশ পাইয়া জাতীয় চরিত্রের সহিত মিশিয়া গিয়াছে, আমাদের দেশে সেরূপ ঘটনার সমাবেশ হয় নাই। অথচ ঐ শব্দগুলি আমাদের রাজনৈতিক বক্তৃতায় শোনা যাইত এবং উহারই বাঙ্গলা তর্জমা জাতীয়তাবাদ, স্বাদেশিকতা এবং দেশাত্মবোধ। এগুলি বিলাতী রাষ্ট্রনীতির অভিধান হইতে ধার করা মুখস্থ বুলি মাত্র—ঐ সকল সংজ্ঞায় অভিহিত করা যায় দেশব্যাপী এমন কোনো আন্দোলন শিক্ষিতবর্গ সৃষ্টি করিতে পারেন নাই, লোকসাধারণকে ডাকও দেন নাই। এই সীমাবদ্ধ এবং আবেদন নিবেদনের রাজনীতি ভদ্রলোকের আন্দোলন। ইংরাজ শাসন ও পরিবর্তিত অর্থনৈতিক অবস্থায় যে মধ্যবিত্ত ভদ্রশ্রেণী গড়িয়া উঠিয়াছিল সেদিনের ভারত ছিল সেই ভদ্রলোকের ভারতবর্ষ।”

সত্যেন্দ্রনাথ আরও বলেন: “ইংরাজি শিক্ষিত ভারতবাসীরা যখন ভিক্ষার দ্বারা অধিকার অর্জনের জন্য ব্যস্ত, তখন আর এক অংশে যে স্বদেশপ্রেম জাগ্রত হয় নাই এমন নয়। কিন্তু সে স্বদেশ ইংরাজের পুঁথিগত স্বদেশ, বিদেশী আইডিয়ার ছাঁচে ঢালা অবাস্তব কল্পনা নয়। বহুকাল বহু সাধনায় মানুষ তাহার জ্ঞান, বুদ্ধি, প্রেম ও কর্ম দ্বারা যে দেশকে সৃষ্টি করিয়াছে, তাহাই তাহার স্বদেশ। তাহার সহিত তাহার জনমণ্ডলীর সহিত নাড়ীর যোগ অনুভব করিবার একটা সাধনা আছে। বিবেকানন্দ সচেতন মন দিয়া সেই সাধনা করিয়াছিলেন বলিয়াই স্বদেশের সমগ্ররূপ তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন।

'ভদ্রসমাজ' ও উচ্চবর্ণের গণ্ডীর বাহিরে লক্ষ কোটি নর-নারীর দুঃখ, ক্লেশ, অবুদ্ধি, কুসংস্কার, হীনতা ও তামসিক জড়ত্ব এ সব কিছু লইয়া যে মানুষ' তাহাদেরই তিনি ভালবাসিলেন। সেই ভালবাসার আলোকে তিনি দেখিলেন অধঃপতন ও আত্মবিস্মৃতি যতই গভীর হউক না কেন, 'ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় ইহাদের মধ্যেও' পূর্বপুরুষগণের শক্তি প্রসুপ্ত রহিয়াছে। কুম্ভকর্ণের দীর্ঘ নিদ্রা ভাঙ্গিবে, জাগ্রত ভারত আবার বিশ্বমানবের জয়যাত্রার সহিত পায়ে পা মিলাইয়া চলিবে।"

অর্থাৎ বিবেকানন্দ দেখলেন যে এ যুগের ইংরাজি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজসংস্কারক বা রাজনৈতিকদের আদর্শ বা গুরু হলেন ইউরোপের বার্ক, সেরিডন, মিল, বেন্থাম বা ইতালীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতা গারিবল্ডী, মাৎসিনী অথবা ফরাসী বিপ্লবের নেতা রোবস্পীয়র। বলা বাহুল্য, তিনি নিজেও এই আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। যুক্তিবাদ, গণতন্ত্র, স্বাধীনতা, সাম্য এ সবের আধুনিককালীন ধারণা সেখান থেকেই উদ্ভূত। কিন্তু তিনি আরও দেখলেন যে দেশের অশিক্ষিত অগণিত জনগণ যে আদর্শ তখন আঁকড়ে ধরে আছে তা হচ্ছে ভারতের প্রাচীন বেদ-বেদান্ত, রামায়ণ মহাভারত, শাস্ত্র পুরাণ, মুনি-ঋষিদের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের আদর্শ। অবশ্য এই ঐতিহ্যের মধ্যে মানবতাবোধ থাকা সত্ত্বেও ছিল অনেক কুসংস্কার, অযৌক্তিকতা, অসাম্য ইত্যাদি। এ সবের সমালোচনা ইতিপূর্বেই সমাজসংস্কারকরা শুরু করে দিয়েছিলেন। কিন্তু যেহেতু সেই সময় বিদেশী ইংরাজ এবং খ্রীষ্টীয় পাদ্রীরা এ দেশের ধর্ম, শাস্ত্র, পুরাণ, সংস্কৃতিকে বিদ্রূপ ও অপমান করছিল, সেই হেতু বিবেকানন্দ ভারতের প্রাচীন ধর্ম ও সংস্কৃতির সমর্থন প্রয়োজন মনে করলেন। তা না হলে দেশের মানুষের সঙ্গে নাড়ির যোগ রাখা যায় না, আর তাদের হৃদয়ও জয় করা যায় না। তাই তিনি যুক্তি-সাম্য-গণতান্ত্রিক দৃষ্টিতে ভারতের এই ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিক মতাদর্শের মধ্যে যা কুসংস্কার, অযৌক্তিকতা, অসাম্য তার যেমন একদিকে সমালোচনা করতে লাগলেন—তেমনি আবার অন্যদিকে তার নতুন ব্যাখ্যা দিয়ে তার মানবতাবোধকেও সমর্থন করলেন। সেই কাজে মাঝে মাঝে হয়তো তাঁর চিন্তায় দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে। কিন্তু সে যাই হোক, সেই হলো সেদিনকার পরিবেশে তাঁর 'আধ্যাত্মিক-রাজনীতি'র পথ গ্রহণের কারণ—তাই তাঁর বাণীর অর্থ সব সময়েই যুগপৎ আধ্যাত্মি ও রাজনৈতিক। আর সেই হলো তাঁর নব্য-বেদান্তের দ্ব্যর্থ ভাষার মাধ্যমে

'কুম্ভকর্ণের ঘুম ভাঙ্গাবার' ডাক। তা ছাড়াও বিবেকানন্দ বললেন: "বেদান্ত কেবল জল্পনার বিষয় হয়ে থাকলে চলবে না, প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় এর প্রকাশ সত্য হয়ে উঠতে হবে। জটিল শাস্ত্র-পুরাণের জট ছাড়িয়ে বাস্তব জীবনের নীতি সন্ধান করে নিতে হবে। যোগের গোলক ধাঁধা থেকে পথ কেটে বের করে নিতে হবে প্র্যাকটিক্যাল মন দিয়ে।" বলা বাহুল্য এই হলো তাঁর "প্র্যাকটিক্যাল বেদান্তে"র দৃষ্টি।

বিবেকানন্দের এই "আধ্যাত্মিক-রাজনৈতিক" দৃষ্টির বিশ্লেষণ করতে গিয়ে পণ্ডিত নেহেরু তাঁর 'ভারত-আবিষ্কার' নামক বই-এ বলেছেন: "বিবেকানন্দের জীবনের ভিত্তি ছিল ভারতের অতীত গৌরবের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত; এ দেশের ঐতিহ্যে তিনি গৌরব অনুভব করতেন—অথচ জীবন সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন তিনি আধুনিক কালোপযোগী মনোবৃত্তি ও দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে। এক হিসাবে তাঁকে ভারতের অতীত ও বর্তমানের মধ্যে সেতুস্বরূপ বলা চলে।"

বিবেকানন্দের রাজনীতি সম্বন্ধে নেহেরু আরও বলেছেন: "বারংবার তিনি বলে গেছেন যে, পরাধীনতা থেকে মুক্তি পাওয়া দরকার, সমাজে সাম্য আনা দরকার, জনসাধারণকে পঙ্কশয্যা থেকে তুলে ধরা দরকার। 'বেঁচে থাকতে হলে, জাতীয় জীবনে উন্নতি ও মঙ্গলের প্রতিষ্ঠা করতে গেলে সর্বপ্রথম প্রয়োজন—চিন্তায় ও কর্মে স্বাধীনতা। যেখানে এই স্বাধীনতা নেই সেখানে ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা জাতির ধ্বংস অনিবার্য।' 'এই অগণিত জনগণ, এরাই ভারতবর্ষের আশা ভরসা। ভদ্রলোকদের কাছ থেকে কিছু আশা করি না, কারণ তারা দেহের দিক থেকে ও মনের দিক থেকে মৃতকল্প।' বিবেকানন্দ চেয়েছিলেন ভারতের আধ্যাত্মিক উন্নতির পটভূমিকায় পাশ্চাত্য জগতের প্রগতিকে প্রতিষ্ঠা করতে—to make a European society with India's religion'। 'সাম্যের দিক দিয়ে, স্বাধীনতার দিক দিয়ে, কর্ম ও শক্তি প্রয়োগের ক্ষেত্রে পাশ্চাত্যকে হার মানাও, কিন্তু ধর্ম সাধনায় ও ধর্মবিশ্বাসে হিন্দুত্ব যেন তোমার অস্থিমজ্জার মধ্যে মিশে থাকে।' ধীরে ধীরে বিবেকানন্দ আন্তর্জাতিকতার দিকে অগ্রসর হন: 'রাজনীতি ও সমাজনীতির ক্ষেত্রেও সে সব সমস্যা একটা বিশেষ কোন দেশ বা জাতির সমস্যা ছিল, আজ সেই সব সমস্যার সমাধান নিছক জাতীয়তার ক্ষেত্রে সম্ভবপর নয়। এই সমস্যাগুলি ক্রমেই বৃহদাকৃতি ধারণ করছে, বিচিত্ররূপে আমাদের চোখের সামনে প্রতিভাত হচ্ছে। এখন আন্তর্জাতিকতার বৃহত্তর ক্ষেত্রেই কেবল এই সমস্যা সমাধান

করা চলবে। আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান, আন্তর্জাতিক সমবায়, আন্তর্জাতিক বিধিব্যবস্থা—এই হলো এ যুগের দাবি।'

পূর্বেই বলেছি সমসাময়িক রাজনীতিতে বিবেকানন্দের কোনো শ্রদ্ধা বা আস্থা ছিল না। কারণ সে যুগে ১৮৮৫ সালে হিউম সাহেব কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসের রাজনীতি ছিল শুধু 'আবেদন নিবেদনে'র ভিক্ষার রাজনীতি। এই প্রতিষ্ঠানে তখন সমাগম হতো শুধু ধনী উকিল ব্যারিস্টার জমিদার ব্যবসায়ীদের। সেই কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশন তখন ছিল ধনীলোকদের 'তিন দিনের তামাশা'র আড্ডা। বাংলা দেশ থেকে যাঁরা কংগ্রেসের তখন সভাপতি হয়েছিলেন তাদের মধ্যে ছিলেন উমেশচন্দ্র ব্যানার্জি, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি, আনন্দমোহন বোস, রমেশচন্দ্র দত্ত, লালমোহন ঘোষ প্রভৃতি। এঁরা কেউই সেদিন জাতীয় স্বাধীনতার কথা বলতেন না। এঁরা সবাই ছিলেন 'নরম পথে'র পন্থী। উনিশ শতকের শেষাশেষি অবশ্য জাতীয় কংগ্রেসে মধ্যে একটি চরমপন্থী দল গড়ে উঠতে থাকে—মহারাষ্ট্রে, পাঞ্জাবে ও বাংলায়। বাংলা দেশের এই চরমপন্থীদের একাংশই বিশ শতকের গোড়ায় সন্ত্রাসবাদী পথ গ্রহণ করে। এই সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের উপরই বিবেকানন্দের প্রভাব তাঁর মৃত্যুর পরবর্তীকালে অনুভূত হতে থাকে। জীবনের শেষ দিকে বিবেকানন্দের রাজনৈতিক দৃষ্টির রূপান্তর দেখতে পাই। বিবেকানন্দের ছোটভাই ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর 'স্বামী বিবেকানন্দ—প্যাট্রিয়ট্-প্রফেট্' নামক বই-এ বলেছেন যে বিবেকানন্দ দ্বিতীয়বার ইউরোপ ভ্রমণের পর যখন বেলুড়ে ফেরেন সেই সময় তিনি ১৯০২ সালে জনৈক তরুণকে (অধ্যাপক কামাক্ষ্যা মিত্রকে) বলেন : "ভারতে এখন বোমার প্রয়োজন"।* তাছাড়া এ প্রশ্নও অনেকের মনে থেকে যায় যে, কার প্রেরণায় বিবেকানন্দের শিষ্যা ভগ্নী নিবেদিতা এই সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন? এ ছাড়া সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের প্রথম দিকে বিবেকানন্দ প্রতিষ্ঠিত 'রামকৃষ্ণ মিশনের' মধ্যে একাধিক সন্ত্রাসবাদী সন্ন্যাস নিয়েছিলেন ; এবং বেলুড়ে 'রামকৃষ্ণ মিশনে' পুলিশের থানাতল্লাসী পর্যন্ত চলে। এ সব কথা আজ বিস্মৃত-ইতিহাস। কারণ পরবর্তীকালে 'রামকৃষ্ণ মিশন' রাজনীতির ছায়াই শুধু এড়িয়ে যায় নি, বিবেকানন্দকে শুধু আধ্যাত্মিক ধূম্রজালে আচ্ছন্ন করেছে। তবে বাংলা দেশে যতদিন পর্যন্ত সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন ছিল, ততদিনই বিবেকানন্দের প্রভাব অব্যাহত ছিল। অর্থাৎ এই শতকের দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশক পর্যন্ত বিবেকানন্দের রাজনৈতিক প্রভাব বাংলার জাতীয় আন্দোলনে বজায় ছিল।

* বিবেকানন্দের 'আধ্যাত্মিক রাজনৈতিক' দৃষ্টি প্রসঙ্গে বিবেকানন্দ কর্তৃক জনৈক মুসলমান বন্ধুকে ১৮৯৮ সালে লিখিত একটি পত্র উল্লেখযোগ্য। এই পত্রে তিনি লিখেছেন : "বাস্তবক্ষেত্রে অদ্বৈতবাদ প্রয়োগের একটি উত্তম উদাহরণ হলো সর্বজীবের মধ্যে আত্মাকে প্রত্যক্ষ করা। এই সর্বভূতে সমদৃষ্টি হিন্দুসমাজে আসার এখনও অনেক দেরী।

অপরপক্ষে দেখতে পাই কার্যক্ষেত্রে ও দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় যদি অন্য কোন ধর্মমতাবলম্বী অনেকটা এই সাম্যাবস্থার দিকে অগ্রসর হয়ে থাকে তো সে হলো যারা ইসলামে বিশ্বাসী।...

আমাদের মাতৃভূমির একমাত্র ভরসা এই যে একদিন হয়তো আমরা ঐই দুই ধর্মমতের—হিন্দুত্বের ও ইসলামের—মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে পারব। বৈদান্তিক মাথা ও ঐস্লামিক দেহ—এর চেয়ে অধিকতর কাম্য আর কিছু হতে পারে না। মনশ্চক্ষে আমি যেন দেখতে পাই ভবিষ্যতের ভারতবর্ষ সর্বদোষ লেশহীন ভারতবর্ষ, সমস্ত বিশৃঙ্খলা, সব কিছু সজ্বাতের উর্দ্ধে উন্নতশীর্ষ অপরাজেয় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, জ্ঞানবুদ্ধির দিক থেকে সে বৈদান্তিক, সমাজ সংগঠনের দিক থেকে সে ঐস্লামিক।"

ডাঃ ভূপেন্দ্র নাথ দত্ত—'স্বামী বিবেকানন্দ—প্যাট্রিয়ট্ প্রফেট্' পৃঃ ২১২

সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন অবশ্য একদল মধ্যবিত্ত তরুণ সম্প্রদায়ের মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল—যদিও সে আন্দোলনের প্রতি সমগ্র দেশেরই মৌন সমর্থন ছিল। পরাধীনতার গ্লানি দূর করার জন্য সশস্ত্র বিপ্লব ছিল এই আন্দোলনের পথ। আর ফরাসী ইটালী, আয়র্লণ্ড ও রাশিয়ার বিপ্লবী সংগ্রাম-কাহিনী ছিল এই আন্দোলনের প্রেরণার উৎস। বিবেকানন্দের দেশাত্মবোধের বাণীর বলিষ্ঠ ও তেজস্বী দিকটিই এই আন্দোলনের মেজাজের সঙ্গে খাপ খেয়েছিল। কিন্তু ঐতিহাসিক অনিবার্য কারণে যখন সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন অবসিত হয়ে গেল, তখন গান্ধীজির আন্দোলনে এবং পরবর্তী শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলনে বিবেকানন্দের বাণীর গণ-আবেদনের দিকটি কেন যে জনমনে সাড়া জাগাতে পারল না সে প্রশ্নের উত্তর আজও পাওয়া গেল না।

উনিশ শতকের অন্যান্য সমাজ-সংস্কারকদের সঙ্গে বিবেকানন্দের তুলনা নিষ্প্রয়োজন। তাঁদের সকলের মধ্যেই স্বাদেশিকতার ভাব অল্প-বিস্তর ছিল। তবে বঙ্কিমচন্দ্র ছাড়া সেই স্বাদেশিকতা এমন তীব্র ও উগ্র অনুভূতিতে বিবেকানন্দের পূর্বে আর কারও বাণীতে প্রকাশিত হয় নি। বিবেকানন্দ

অবশ্য তাঁর পূর্ববর্তী ধর্মসংস্কারক ও সমাজ সংস্কারকদের ধারাকেই সমর্থন করতেন। রামমোহন, ডিরোজিও, বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র প্রভৃতির যুক্তিমূলক সংস্কার প্রচেষ্টারই তিনি আজীবন বাহক ছিলেন। তবে এই সংস্কার আন্দোলনকে তিনি দরিদ্রের মধ্যেও সঞ্চালিত করার আহ্বান জানান। সে যুগে ধর্মের নামে উচ্চ জাতিরা নিম্ন জাতিকে অস্পৃশ্য জ্ঞান করতেন। বিবেকানন্দ সেই ধর্মের নারায়ণকেই প্রমাণ করলেন দরিদ্রের মধ্যে প্রকাশমান—আর সেই দরিদ্রনারায়ণ সেবাকেই যুগের ধর্ম বলে প্রচার করলেন। এই কথা সে যুগে একটি বিশিষ্ট অবদান। তিনি বললেন: "ঈশ্বর কোথায়, ঈশ্বর কোথায় বলে চারিদিকে কেন তুমি বৃথা অন্বেষণ করছ! তিনি তো তোমার সামনেই রয়েছেন। নিরন্নের মধ্যে, পীড়িতের মধ্যে, আর্তের মধ্যে, পতিতের মধ্যে, অজ্ঞানীর মধ্যে, অস্পৃশ্যের মধ্যে তোমার নারায়ণ উজ্জ্বলভাবে প্রকাশমান রয়েছেন। একবার জ্ঞানচক্ষু মেলে তাঁকে দর্শন কর এবং এই সকল দরিদ্র-নারায়ণের সেবা করে তোমার ইষ্ট দেবতার প্রিয় কর্ম সাধন কর। তুমি এদের দুঃখ দূর করতে সমর্থ হয়েছ বলে কখনও অহঙ্কারে স্ফীত হইও না। এদের সেবা করার অধিকার পেয়েছ বলে অপনাকে ধন্য বলে বিবেচনা কর।" বলা বাহুল্য এই দরিদ্র-নারায়ণ সেবাই দুই-তিন দশক পরে গান্ধীজির 'হরিজন-সেবা'য় রূপান্তরিত হয়।

এখানে বলা প্রয়োজন বিবেকানন্দ অবশ্য সমাজসংস্কার, ধর্মসংস্কার ও দেশাত্মবোধ জাগাবার উদ্দেশ্যে ভারতের প্রাচীন সামন্ততান্ত্রিক আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের গুণগান করেছেন। কিন্তু সেটা করেছেন শুধু সামন্ততান্ত্রিক ঐতিহ্যের মধ্যে থেকে মানবিক গুণ টেনে বার করে দেখাবার জন্য। আসলে তাঁর লক্ষ্য ছিল সামন্ততন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে "ভারতের ধর্মের উপর ইউরোপীয় সমাজ গড়ে তোলা"। তাই বিবেকানন্দের চিন্তার মধ্যে সর্বত্রই দেখি এক দ্বন্দ্ব: প্রাচীন আদর্শের প্রতি একটা 'পিছুটান' এবং নতুন সমাজ গড়ার জন্য আর একটা 'সম্মুখটান'। কিন্তু তখনকার "ইউরোপীয় সমাজ" অর্থাৎ স্বাধীন বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র গড়ে তোলার প্রতিই তাঁর প্রবণতা বা আগ্রহ ছিল বেশি। তিনি এ কথাও বলেছিলেন: "যে প্রকার প্রাচীন যুগে রাজশক্তির পরাক্রমে ব্রাহ্মণ্যশক্তি বহু চেষ্টা করিয়াও পরাজিত হইয়াছিল—সেই প্রকার এই যুগে নবোদিত বৈশ্যশক্তির প্রবলাঘাতে কত রাজমুকুট ধূল্যবলুণ্ঠিত হইল, কত রাজদণ্ড চিরদিনের মত ভগ্ন হইল"।

বিবেকানন্দের এই ধারণাকে বৈশ্য বা বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্র বলা ছাড়া উপায় কি?

কিন্তু এই কথাই শেষ কথা নয়। বিবেকানন্দ ইওরোপ, আমেরিকায় গিয়ে যেমন একদিকে এই গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের ঐশ্বর্য, সংগঠনশক্তি, বিজ্ঞান, কর্মপ্রবণতা (রজঃগুণের) প্রশংসা করতে লাগলেন—তেমনি আবার সেখানে ধনী-দরিদ্রের মধ্যে পার্থক্য, শ্রমিক-মালিকের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখে মর্মাহত হলেন। তিনি সেখানে ধর্মমঠও দেখলেন। শোষক ও শোষিত দেশের মধ্যে দ্বন্দ্ব এবং সাম্রাজ্যবাদের হিংস্র রূপ দেখেও তিনি ক্লিষ্ট হলেন। তাই তিনি বললেন: "আলেয়ার পশ্চাতে ধাবমান হইও না। ধনীতন্ত্রীয় পাশ্চাত্য সমাজ যাহা শোষণ নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত যাহা গরীবকে ধ্বংস করিয়া স্বীয় কলেবর স্ফীত করিতেছে, তাহা একদিন ফাটিয়া পড়িবে"।

তিনি আরও বললেন: "সমস্ত পাশ্চাত্য জগৎ একটি আগ্নেয়গিরির উপর রহিয়াছে। তাহা কালই ফাটিতে পারে এবং টুকরা টুকরা হইয়া যাইতে পারে। উহারা পৃথিবীর প্রত্যেক অলিগলিরই সন্ধান করিয়াছে কিন্তু সমাধান পায় নাই।"

এই দ্বন্দ্ব-পরিপূর্ণ পাশ্চাত্য সমাজ-সমস্যার বিবেকানন্দ-নির্দেশিত সমাধান হল 'সাম্য' প্রতিষ্ঠা। এই সাম্যদৃষ্টিতে যদি সব দেশের, সমাজের ও মানুষের মধ্যে দ্বন্দ্ব দূর করা যায় তা হলেই সমাজে সুখ-শান্তি আসবে। সে সুখ-শান্তি আবার মানুষের অন্তরেও প্রতিফলিত হবে। পূর্বেই বলেছি বিবেকানন্দ তাঁর 'সামাজিক সাম্যে'র ধারণা পাশ্চাত্যের ফরাসী বিপ্লবাদর্শের কাছ থেকে পেয়েছিলেন। আর আধ্যাত্মিক সাম্যদৃষ্টি পেয়েছিলেন ভারতের বেদান্ত থেকে। এই দুটিকে তিনি মিলিয়ে নিয়েছিলেন—তবে আত্মিক (subjective) বা আধ্যাত্মিক সাম্যদৃষ্টির প্রতি তাঁর চিন্তার প্রবণতা ছিল বেশি।

তবে সর্ব স্তরের সাম্য—কি আত্মিক, কি সামাজিক ও কি অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠার কথাই বিবেকানন্দ বলেছেন। এবং সেই সামগ্রিক সাম্য প্রতিষ্ঠাকল্পেই বোধহয় তিনি 'সমাজতন্ত্রে'র কথা বললেন।

এই 'সমাজতন্ত্র' কথাটি বিবেকানন্দ দু-একবার মাত্র ব্যবহার করেছেন। তবে তিনি একবার ঘোষণা করেছিলেন এই বলে যে 'I am a socialist'। যতদূর জানা যায় ১৯০০ সাল নাগাদ তিনি এই কথা বলেছিলেন।

বিবেকানন্দের পূর্বে ১৮৭৯ সালে বঙ্কিমচন্দ্র 'সাম্য' নামে একখানি পুস্তিকা

প্রকাশ করেন। যতদূর মনে হয় ছুটি দেশী ও বিদেশী তরঙ্গাঘাতেই বঙ্কিম এই 'সাম্য' প্রবন্ধ লেখেন। একটি তরঙ্গ হলো তখনকার গ্রাম-বাংলার কৃষক সংগ্রামের তরঙ্গ—যেমন পাবনার কৃষক বিদ্রোহ, নীল বিদ্রোহ প্রভৃতি। দ্বিতীয় তরঙ্গটি হলো ইওরোপীয় সাম্যমূলক চিন্তার তরঙ্গ। এই ছুই তরঙ্গের ফলই বঙ্কিমের সাম্য-চিন্তার উদ্ভব। কিন্তু যে ইউরোপীয় সাম্যচিন্তার সঙ্গে বঙ্কিম পরিচিত ছিলেন তা হচ্ছে রবার্ট ওয়েন, লুই ব্লাঙ্ক, সেণ্ট সাইমন, ফুরিয়ার প্রভৃতির সমাজতন্ত্রের চিন্তা। অর্থাৎ ইউটোপিয়ান সমাজতন্ত্র ছিল তাঁর চিন্তা-তরঙ্গের উৎস। মার্কস এঙ্গেলসের সমাজতন্ত্র নয়।

বিবেকানন্দের সমাজতান্ত্রিক চিন্তাও দেশী বিদেশী প্রভাবে গড়ে উঠেছিল। প্রথমত, দেশের ছুর্বিষহ দারিদ্র্য ও সামাজিক ভেদাভেদ দূরীকরণ, দ্বিতীয়ত, বেদান্তের আধ্যাত্মিক সাম্যদৃষ্টি প্রতিষ্ঠা; তৃতীয়ত, ইওরোপীয় সমাজতান্ত্রিক চিন্তার সঙ্গে পরিচিতি—এগুলিই বিবেকানন্দের সমাজতান্ত্রিক ধ্যানধারণার নিয়ামক। তবে তাঁর সমাজতান্ত্রিক ধ্যানধারণাও কাল্পনিক; কিন্তু তা বঙ্কিমের 'সাম্য' প্রবন্ধের ধারণার ঠিক অনুরূপ নয়। বিবেকানন্দ অনেক প্রগতিশীল চিন্তার অবতারণা করেছেন—অথচ অনেক উদ্ভট মন্তব্যও করেছেন। তবে বঙ্কিম তাঁর 'সাম্য' প্রবন্ধ পরবর্তীকালে প্রত্যাহার করেছিলেন। কিন্তু বিবেকানন্দের পূর্ণ আস্থা ছিল তাঁর সমাজতন্ত্রের উপর।

তিন চার দশক পূর্বে 'অদ্বৈত-আশ্রম' কর্তৃক প্রকাশিত বিবেকানন্দের 'Caste, Culture and Socialism' নামক পুস্তিকার ভূমিকায় বলা হয়েছে :

"True, Swami Vivekananda had an intimate knowledge of such western movements as Anarchism, Nihilism, Socialism, and Commusism from their literature as well as from personal contacts. He met Peter Kropotkin at the Paris International Exhibition (1900) ; and Plekhanoff's party was then very active in England. These movements were then in their infancey ; and even their protagonists had no great hope for the causes they advocated. It was remarkable, therefore, for such an Orientalist as Swami Vivekananda to prophesy at that distant date that "Socialism of some forms was coming on

the boards," and that the "Shudras as Shudras would be the future ruling caste."

সেই সুদূর অতীতে—সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সফল হবার অনেক পূর্বে—বিবেকানন্দের পক্ষে সমাজতন্ত্র সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী সত্যই প্রশংসনীয়। তবে তিনি পিটার ক্রোপটকিনের কাছ থেকে কি খবর জানলেন তার সম্বন্ধে কোনো উল্লেখ কোথাও নেই। তা ছাড়া মার্কস, এঙ্গেলস বা লেনিন সম্বন্ধেও কোনো উল্লেখ নেই। সুতরাং যতদূর জানা যায় তাতে মনে হয় বিবেকানন্দ মার্কস-পূর্ব সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার সঙ্গেই পরিচিত হয়েছিলেন। অবশ্য এই ভূমিকায় 'কমিউনিজম' কথাটিরও উল্লেখ আছে—কিন্তু বিবেকানন্দের সমাজতান্ত্রিক রচনার মধ্যে তার কোনো উল্লেখ দেখি না।

উপর-উক্ত পুস্তিকাটিতে বিবেকানন্দের সব সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারা সঙ্কলিত করা হয়েছে—তার মধ্যে 'I am a Socialist' প্রবন্ধটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এতে অনেক অপরিচ্ছন্ন, বাঁকাচোরা কথা থাকা সত্ত্বেও এতে বিবেকানন্দের বক্তব্য হলো : "সমাজতন্ত্রের ব্যবস্থা সর্বতোভাবে ভাল বলে আমি মনে করি না। কিন্তু নেই মামার চাইতে কানা মামা ভাল। অন্যান্য রাজনৈতিক মতবাদ কাজের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে দেখা গেছে সেগুলির দ্বারা সমস্যা মেটে না। একবার সমাজতন্ত্র নিয়েই পরীক্ষা করে দেখা যাক না; আর কিছু না হলেও ও একটা নতুন চেষ্টা ত বটে।" অর্থাৎ বিবেকানন্দের মত হলো বুর্জোয়া গণতন্ত্র বা অন্যান্য সমাজ ব্যবস্থার চেয়ে সমাজতন্ত্র শ্রেয়—তবে তা নিখুঁত সমাজব্যবস্থা নয়। বিবেকানন্দ সমাজতন্ত্রের কোনো বৈজ্ঞানিক অর্থনৈতিক ভিত্তি বা রাষ্ট্রিক কাঠামোর তত্ত্ব খাড়া করেন নি। তবে তিনি বলেছেন ধনী আরও ধনী হচ্ছে এবং দরিদ্র আরও দরিদ্র হচ্ছে। তাছাড়া তিনি বলেছেন জগতে পর পর ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের যুগ আসবে। আর বৈশ্য যুগ উত্তীর্ণ হয়ে যখন শূদ্র যুগ আসবে—তখন তা শূদ্র প্রাধান্যযুক্ত সমাজ হবে। শূদ্র বলতে তিনি মনে করতেন শ্রমিক, কৃষক এবং সমাজের নিম্ন শ্রেণীকে। অর্থাৎ বিবেকানন্দের 'প্রলেটারিয়েট' এক ব্যাপক অর্থে 'সব মেহনতী মানুষ'। এই শূদ্র প্রাধান্যযুক্ত সমাজে সকলের শিক্ষা, জ্ঞান ও ধনলাভের সমান সুযোগ থাকিবে। তবে বর্তমান সমাজে শোষক ও শোষিত শ্রেণীর মধ্যে যে দ্বন্দ্ব আছে তা কোনো শ্রেণী সংগ্রাম বা বিপ্লবের মাধ্যমে দূরীভূত করার কথা তিনি বলেন নি। তিনি তাঁর শূদ্র প্রাধান্যযুক্ত সমাজের লক্ষ্যে পৌছানর জন্য শুধু

শিক্ষা, সংস্কৃতি ও বেদান্তের আধ্যাত্মিক সাম্যজ্ঞান বিস্তারের কথাই বলেছেন। এর ফলেই সমাজের উচ্চশ্রেণীরা শূন্যে বিলীন হয়ে যাবে, আর তার স্থানে উদয় হবে শূদ্র প্রাধান্যযুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজ—সেখানে অবশ্য প্রতিষ্ঠিত হবে আধ্যাত্মিক, সামাজিক ও আর্থিক সাম্য।

বলা বাহুল্য সুদূর অতীতে এ চিন্তা-প্রয়াস নিঃসন্দেহেই প্রগতিশীল পদক্ষেপ। হয়তো দেশের মাটিতে উপযোগী পরিবেশের প্রস্তুতি হয় নি বলেই সে চিন্তা সুসংহত হয়ে একটি সম্পূর্ণ মতবাদের রূপ নিতে পারে নি। অসংলগ্ন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য চিন্তার সমন্বয়ে তবুও তাঁর যে সাম্যের দুর্বার আকাঙ্ক্ষা এর মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে, সেইটেই উল্লেখযোগ্য ঘটনা। দুঃখের কথা যে বিবেকানন্দের এই সামাজিক চিন্তা সেদিন জনমনে কোনো রেখাপাত করতে পারে নি। তার কারণ হয়তো সেদিনকার সামন্ততান্ত্রিক পটভূমিকায় সে চিন্তা ছিল অত্যন্ত অবাস্তব—সেটা যেন শূন্যে হাওয়ায় ঝুলছিল। তবে উত্তরকালে বিবেকানন্দের সমাজতন্ত্র কেন যে দেশের মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করল না সে কথা বুঝতে পারা যায় না। হয়তো তার একটা কারণ হলো যে, যখন আমাদের দেশে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর যথার্থ শ্রমিক আন্দোলন শুরু হলো তখন ইতিপূর্বেই সমাজতান্ত্রিক অক্টোবর বিপ্লব সার্থক হয়ে গেছে। সেই আসল সমাজতান্ত্রিক চিন্তার সঙ্গে পরিচিতির পর বিবেকানন্দের সমাজ-তন্ত্রের প্রতি বোধহয় আর দেশের মানুষের কোনো আগ্রহ জন্মাল না। কিন্তু তবুও দেশের মাটিতে যে সমাজতান্ত্রিক চিন্তা ইতিপূর্বে একটা নতুন ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছিল তার প্রতি মর্যাদা দেখালে হয়তো দেশের জনচিত্তে সমাজতন্ত্র তাড়াতাড়ি শিকড় গাড়তে পারত। দরিদ্র-দরদী বিবেকানন্দ যে সমাজতন্ত্রীও ছিলেন, এ কথার প্রচার-প্রচেষ্টায় দেশের সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের পথ প্রশস্তই হত বলে মনে হয়।

যতদূর মনে পড়ে ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত দু-দুবার চেষ্টা করেছিলেন যাতে বিবেকানন্দের সমাজতান্ত্রিক চিন্তা দেশের মধ্যে স্বীকৃতি লাভ করে। হয়তো সে প্রচেষ্টার উৎসাহ আতিশয্যে তিনি বিবেকানন্দ সম্বন্ধে অনেক অত্যুক্তি করেছিলেন। কিন্তু সে কথা বাদ দিলেও, তাঁর প্রচেষ্টা যে রাজনৈতিক মহলে কেন সার্থক হলো না তা দুর্জ্ঞেয়। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে রুশ দেশে লেনিনের কথা। মার্কসের বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের ধারক ও বাহক হওয়া সত্ত্বেও, তিনি আধ্যাত্মিক টলস্টয়কে 'ইউটোপিয়ান সমাজতান্ত্রিক' বলে সাদর সম্ভাষণ জানিয়ে

তাঁর প্রতি সম্মান দেখাতে কুণ্ঠা বোধ করলেন না। কারণ শোষিতজনের প্রতি সহানুভূতিতে ও মানুষের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষায় রুশ হৃদয়ে টলস্টয়ের স্থান ছিল শ্রদ্ধার মণিকোঠায়। সেই হৃদয়কে নাড়া দিতে গেলে দরিদ্র-দরদী টলস্টয়ের অস্ফুট সমাজবাদী চিন্তাকে উপেক্ষা বা অবহেলা করা তাই বোধহয় সমীচীন বলে মনে হয় নি।

অবশ্য আমাদের দেশে বিবেকানন্দ-চিন্তাধারার একদল উত্তরাধিকারী আছেন। মনে হয়, তাঁরা আজ উচ্চবিত্ত ও উচ্চশিক্ষিতের পৃষ্ঠপোষকতায় দরিদ্র-নারায়ণসেবী বিবেকানন্দকে ভুলতে চান। আধ্যাত্মিকতার অস্পষ্ট তত্ত্বালোচনায় বিবেকানন্দকে আরও দুর্জ্ঞেয় ও দুর্বোধ্য করে তুলতেই তাঁরা আজ বেশি উৎসাহী। ফলে, বিবেকানন্দের রাজনৈতিক ও সমাজতান্ত্রিক চিন্তা বিস্মৃতির অতল তলে তলিয়ে যাচ্ছে।

এই প্রবন্ধের জন্য যে বইগুলির উপর নির্ভর করতে হয়েছে :—

সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার—'স্বামিজী ও দেশাত্মবোধ' (প্রবন্ধ পুস্তিকা)
Subhas Chandrs Bose—'Life and Writings'. Part I
Swami Vivekananda—'From Colombo to Almora'
Letters of Swami Vivekannnda.
পণ্ডিত নেহেরু—'ভারত-আবিষ্কার'
Bhupendra Nath Dutt—Swami Vivekananda—Patriot-Prophet
বিবেকানন্দ—'বর্তমান ভারত'
Swami Viʌəkananda's Works. Vol. III
Swami Vivekananda—'Caste, Culture and Socialism'.

নবজাতক ॥ জগদীশ ভট্টাচার্য

কড়া খাড়া লোম ঘাড়ে
মেটে সাদা শুয়োরের দল
ঘুরে ফেরে বেওয়ারিস মাঠে।
কুশ্রী জীব, কদর্য গড়ন ;
কাদা ঘাঁটে, নোংরা খায়,
জুগুপ্সা জাগায়।
ওরি মাঝে
দেখো দেখো, কী আশ্চর্য ছুটি ছোট ছানা।—
গোলাপী ফুলের রং তুল্তুলে তুলো দিয়ে ঢাকা।
তুব্‌তুরে চার পায়ে নেচে নেচে চলে।
পায়ের পাখায় যেন মাটির আকাশে উড়ে যায়।
উড়ে যায় গান হয়ে,—শব্দহীন জীবনের গান।

ওরা আগন্তক,
মর্তের মাটির বুকে প্রাণের আনন্দ ওরা,
নাচের পুতুল।
দেখো দেখো
কী সুন্দর,
খোলা মাঠে খেলা করে নবজাত শুয়োরের ছানা॥

সব পাওয়ার ছড়া ॥ সলিল চৌধুরী

মনে কর সব পাওয়া গেল
ক্যাডিলাকে চেপে যাওয়া গেল
ফারপোয় বসে খাওয়া গেল
আতরের জলে নাওয়া গেল
মূলতানী টোড়ী গাওয়া গেল

যে মেয়ের পিছে ধাওয়া গেল
চোখে চোখ রেখে চাওয়া গেল
শয্যায় শেষে পাওয়া গেল

মনে কর সব পাওয়া গেল
যত কিছু ছিল চাওয়া গেল

মনে হবে হেরে যাওয়া গেল॥

এইখানে শতকে, এখন ॥ শেখ আবদুল জব্বার

এইখানে শতকে, এখন
পরশ্রমজীবীদের অন্ধকার পথহাঁটা অতীতের ঐশ্বর্যের
সদম্ভ বিলাসে—

সংঘটিত গোপন ঘুণ, উৎকোচ, মুখোশ-বদল···
মানবব্যতীত নগরীকে বড় করবার হাজার প্রচেষ্টা মূঢ় তাদের শিরায়—
জন-মানসের পৃথিবীতে সৃজন করেছে এক গূঢ়-কূট কুয়াশার ভোর ;
যার ভরা তমসার তলে
পথে পথে হাত তুলে জলে ওঠে শাল ও পিয়াল, অন্তহীন মূর্ত প্রতিবাদ—
নদীর জলের ঢেউ—মানুষের চেতনায়—সব তীর ভেঙে ভেঙে
গড়ে তুলে দিতে চেয়ে

হরিৎ-প্রদেশ
অন্ধকার, আরো বড় অন্ধকার ভাঙে আজ মুক্তপ্রাণ মানুষেরা জ্যোতির্ময়
বলয়ে বলয়ে।

পাখি প্রজাপতি আর নিসর্গের প্রিয়শোভা অন্ধকারে মিশে গিয়ে
অন্ধকার হয়ে গেছে,
এ ভোরে চতুর্দিকে চোখে চোখে বেদনা-শিশির,
এবং জীবন ঢের ব্যথার প্রহারে, চেতনার আরো বড় ঝড়ে
কী আলো চেয়েছে সে, কোন্ দূর দেশ, সংবর্তের গানের ভিতরে
নিজের শরীর আজ নিজেই খণ্ডিত করে নীতি-নিয়মের বিষ্ণুচক্র দিয়ে ;
আর ঢের গড়ে তোলা অন্ধ-শত নীতি-পীঠস্থান—
মানুষের হৃদয় ও মানুষের চেতনাকে বিকলাঙ্গ করে মানুষেরা
চাইছে অজেয় হতে, সময় ও মৃত্যুত্তীর্ণ মহাজন হতে—অনশ্বরতার বোধ
তাদেরও বেঁধেছে বুকে
প্রিয়ার মতন।

যদিও বিপন্ন রাত্রি, নেকড়ে হাওয়ার দাঁত, আরো বড় গূঢ় অন্ধকার
তাদের হৃদয়ে এনে দিয়েছে বিধ্বংসী হুন,
তবু মানুষের প্রচেষ্টার অনেক আলোক পথে চোখ তুলে জলে আছে,
বুলভার, বাতাসের বনে—অনেক গানের গলা রয়ে গেছে, ঝিঁঝির রেয়াজে
যেখান থেকে, মহাসাগরের ভোরে জাগবে নতুন আলো—
শুভ্রকোমল আলো

মহামুক্ত মানবিকতার।

উল্লসিত অতীতের উলঙ্গ পাশবিকতা থেকে
আজকের নবসূর্যে আলোকের যত রশ্মিপাত—শান্তির প্রসার আর
ঔজ্জ্বল্য প্রসার—
করে করে জন-জাতকের লোক-মানসের মানবিক ফুলগুলো ফুটিয়েছে
গাঢ় মমতায়,

সৌগন্ধের দীর্ঘপথ প্রান্তর প্রদেশে আজো তাই জন্মেচ্ছু
নবজাতকের লোভে উন্মুখ হয়ে আছে,
অফুরন্ত পৃথিবীর সবুজের লাবণ্যের সমারোহ পেতে।

নবীন এ বিপর্যয় উত্থিত বাস্তব থেকে, সর্বঘটে, মথিত সত্তার কেন্দ্রে
এবং নিসর্গেও প্রসারিত, প্রতিহত, প্রতিহত, প্রতিহত হতে হতে শেষে
অতীত প্রয়াণের বিম্বিত ম্লানিমার বুক চিরে কেবলই মানব জেগে ওঠে
সীমাহীন সময়ের রৌদ্রের ভিতরে।

এইখানে শতকে, এখন
চতুর্দিকে উজ্জ্বলতা তবু এই উজ্জ্বলতা পৃথিবীর নয় ;
এখন নবীন ঊষা, তাই এই ঊষাভাস পৃথিবীর বলে মনে হয় !
এবং মানুষ আজো হৃদয়ের রোগে, বিশাল অস্তিত্ব চেয়ে একাকার
হতে যেতে যেতে

কেবলই শুনছে সেই মহাসাগরের গান ;
যেখানে কড়ি পাহাড়, সজীব শঙ্খের স্তূপ, ফেনিল জলের ঢেউ,
মহামুক্ত সমবেত প্রাণের মাতন ;

গড়ে দেয় মহাদেশ, সবুজ ঘাসের দ্বীপ, এনে দিতে সূর্যের সোনা-প্রস্রবণ।

দীক্ষিতের অভিজ্ঞান ॥ অশোক মুখোপাধ্যায়

কবে তাকে দেখেছিলুম
ঠিক মনে পড়ে না।
যেন এক রাত্রির অন্ধকারে
যখন ঝিঁঝিঁর শোকাহত ক্রন্দন
দিবসের মৃত্যুকে চিহ্নিত করছে।
কিন্তু যদি তাই হবে
এত দীপ্তি, এত ঐশ্বর্য কেন আমার স্মৃতিতে ?

না, মনে হয় তাকে দেখেছিলুম
দুপুরের অগ্নিঝোরায়,
যখন আমাকে দীক্ষিত করার জন্য
সে দু হাত বাড়িয়েছিল।

কিন্তু যদি তাই হবে
এত রমণীয়তা, এত আনন্দ কেন আমার চেতনায় ?

এখন আমি জানি
অন্ধকারে নয়, খররৌদ্রে নয়,
আমি কোথাও তাকে দেখিনি,
দেখব না,
তাকে দেখা যায় না।
আমার শোণিতে তার জন্ম,
আমার পৌরুষে তার পদচারণা,
আমার দীপ্র অঙ্গীকারে তার অবয়ব,
জনারণ্যের স্তব্ধতায়
তার কণ্ঠ।

কান পেতে শোনো
সে মাটির ওপর হাঁটছে ॥

বটা সান্যালের অন্তর্দ্বন্দ্ব

দেবেশ রায়

"হ্যালো, হ্যাঁ আমি, হ্যাঁ।" পা চুলকোতে চুলকোতে কথাগুলো শুনতে লাগলেন বটা সান্যাল। গায়ের মোটা গরম চাদরে প্রায় পা পর্যন্ত ঢাকা। শোনার সময় তার মুখরেখার কোনো পরিবর্তন হচ্ছিল না। পথ দিয়ে মাইক ফুঁকতে-ফুঁকতে গেল, তখন বটা সান্যাল বার কয়েক পরপর জিজ্ঞাসা করলেন "অ্যাঁ, কি ? ধুত্‌তোরি।"—মাইকটা একটু অস্পষ্ট হতেই আবার প্রশান্ত হয়ে বললেন—"বলো।" তারপর কড়ে আঙুল দিয়ে খালি কানটা চুলকোতে লাগলেন।

"আই-টি-পি-এ-তে (ভারতীয় চা-শিল্পপতিদের সংস্থা) ফোন করেছ ? অ্যাঁ, আচ্ছা, নিমাইদাকে একটা ফোন, আচ্ছা, আমি-ই করব, ম্যানেজারকে একটা ফোন করে, আচ্ছা দাঁড়াও নিমাইদা কী বলেন আগে, আচ্ছা দরকার নেই, পে-ডে করবে, আজ মঙ্গলবার, এখনো বুধ-বিষ্যুদ-শুক্কুর, বুধ-বিষ্যুদ দুদিন বাকি আছে, বাগানে ফোন করে বলে দাও, যে, শুক্কুরবারে এবার পেমেণ্ট নাও হতে পারে," ফোনটা কানে রেখেই বোতাম টিপে দিলেন সান্যাল। বোতাম ছেড়ে একটা নম্বর চাইলেন, তারপর এই কথাগুলি বললেন, "কে ? ও, আমি বটাদা বলছি, নিমাইদা কোথায় রে ? একটু দে তো, বল্ যে, আমি চাইছি"—ফোন ধরে রেখেই চিৎকার করে বললেন, "ঠাকুর এক কাপ চা দাও।"

যে ঘরে বসে বটা সান্যাল কথা বলছিলেন, সে ঘর থেকে সম্মুখে বড় রাস্তা এবং পেছনে রান্নাঘর সমান দূরত্বে। "হ্যালো, হ্যালো, নিমাইদা, আমি বটা বলছি। ব্যাঙ্ক তো আজ বলে দিল—"

"........."

"হ্যাঁ, তা অবিশ্যি ঠিক, কদিন থেকেই বোঝা যাচ্ছিল, তবে একেবারে বন্ধ করে দেবে ভাবি নি, এখন করি কি ? দুদিন বাদে বাগানের পে-ডে, হ্যাঁ-হ্যাঁ তা করে দিতে বলেছি, কিন্তু এ-সপ্তাহ না-হয় গেল, তারপর ?"

"........."

"না, এখন ইউনিয়ন কিছু করতে পারবে না। আই-টি-এ-তে (বিদেশী চা-শিল্পপতিদের সংস্থা) ফোন করেছিলেন না কি ?"

"...... .."

"দেখলেন, সায়েব ব্যাটারা টাকা পায় ঠিকই, আর ওদের বাগানগুলো তো যুদ্ধের একেবারে সামনে।—আচ্ছা, রাত্রিতে কথা হবে—নিমাই দা, ফ্যামিলি ট্যামিলি শিফ্‌ট্ করতে—"

"........."

"হেঁ হেঁ হেঁ আচ্ছা আচ্ছা, আ—চ্ছা" অপর দিকের রিসিভার রাখার শব্দ শোনা যাবার পর বটা সান্যাল ফোনটা নামিয়ে রেখে, হাতটা ফোনের ওপর রেখে জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে বসে রইলেন, সিনেমার বিজ্ঞাপন লাগানো গাড়িটা ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে, আবার মাইক, ঠাকুর এসে সেক্রেটারিয়েট টেবলটার ওপর চা রেখে চলে গেল, কিছু চা কাপ থেকে ডিসে ছল্‌কে পড়ল, দু-এক ফোঁটা ছাই-ছাই রঙের রেক্সিনের ওপর। হাতে যে চা লেগেছিল, যাবার সময়, ঠাকুর পর্দায় মুছে গেল। ফোনটা তুলে খুব অন্যমনস্কভাবে একটা নম্বর বললেন সান্যাল। "নরেন আছে নাকি ?"...। "নরেন, শুন্‌ছ তো সব ? নাও সম্পত্তি সামলাও এবার। শালা সর্বস্ব যাবে—কী ?" "......।" "রাখ্‌ তোর রসিকতা। পরশুদিন পে-ডে। এবার না-হয় পেমেন্ট বন্ধ করলে, সামনের বার ? কী, তার পরের বার ?" ".. ...।" "অ্যাঁ তাই নাকি ?" ফোনে মুখ রেখে বেশ কিছুক্ষণ হাসলেন সান্যাল, "আমাদের বাগানে তো সে পথও নেই, ইউনিয়নও তো কোম্পানির, কাকে পুলিশে ধরাবি ? হ্যাঁ শোন, নিমাইদার বাগানের কী ব্যাপার জানো ? ও। না আমি কিছু জিজ্ঞাসা করি নি। তবে কথাবার্তা শুনে মনে হলো যে ওঁকে এখনো সমস্যাটা ফেস্ করতে হয় নি ?" "......।" "না, না, আমি তুলনা করছি না। তা তো ঠিকই, ওঁদের তো আর অভাব নেই। দরকার পড়লে নিজেদের পকেট থেকেও বাগান চালাতে পারবে, আমাদের-ই বিপদ। আচ্ছা, বিকেলে আসিস কিন্তু—।" আগের দু জনের সঙ্গে কথাবার্তা বলে মনে যে দমে যাওয়া ভাবটা এসেছিল সেটা তৃতীয় জনের সঙ্গে বাক্যালাপের পর কেটে গেল। সেই আরামে চায়ের কাপটা তিন চুমুকে খালি করে দরজায় দাঁড়িয়ে আড়মোড়া ভাঙলেন বটা সান্যাল। রোদ এসে পড়েছে লম্বা শরীরটাতে। চেঁচিয়ে

ডাকলেন—"বিশ্বনাথ, বিশ্বনাথ।" নীরবতার শেষে, বড় রাস্তা থেকে এই বাড়ির সীমানায় ঢুকলে ডানপাশে ও বাঁ-পাশে যে ঘরগুলো আছে তার একটা থেকে, একটি যুবক কম্বল গায়ে বেরিয়ে এলো। "কী রে, টাউনের ট্রাকগুলো ছেড়েছে ?"

"না, ছাড়বে কোথায়, আরো সব নিচ্ছে—"

"প্রাইভেট গাড়ি নেবে নাকি কিছু শুনেছিস—"

"জিপ নিতে পারে, কার-টার নিয়ে কী করবে ?"

"গাড়ি এখন বের করবি না—বুঝলি ? কিছুতেই না—কেউ জিজ্ঞাসা করলে বলবি খারাপ আছে—"

"বড়মা বলছিলেন আজ সিনেমায় যাবে—"

"আহা-হা, সিনেমায় যাবে ? সব বড়লোক, সুখের পায়রা সব, রিক্সা করে যেতে বলবি, গাড়ি বের করবি না—"

বটা সান্যাল সিঁড়ি দিয়ে নেমে যে ঘরগুলির একটি থেকে বিশ্বনাথ বেরিয়ে এসেছিল, তার বারান্দায় গিয়ে হেলান দেওয়া বেঞ্চে বসলেন। ওখানে বসলে কোমর পর্যন্ত রোদ আসে। লোকজনও এখন আসবে।

এই বটা সান্যাল একজন শিল্পপতি। চা-শিল্পে অর্থ বিনিয়োগ করে, তিনি তার পতিত্ব অর্জন করেছেন। বর্তমানে চার-ব্যক্তির সঙ্গে তিনি যে কথোপকথন করলেন তার প্রেক্ষিতে: চীন-ভারত যুদ্ধ, ফলে ব্যাঙ্ক কর্তৃক বাগানকে টাকা দিতে সঙ্কোচ, অথচ এ অঞ্চলের সবচেয়ে বড় দেশী মালিক নিমাই ঘোষ এবং সাহেব কোম্পানিগুলি টাকা পাচ্ছে, বাগানের ট্রাক সব মিলিটারি নিয়েছে, ফলে চা-বাক্স স্টেশনে পৌঁছচ্ছে না।

"কী বাবু এবারের শীতটা যে বৃথাই চলে গেল" বলে উপেন নাপিত এসে মেঝেতে উবু হয়ে বসে দুই হাঁটুর ওপর দুই হাত পরস্পরের ওপর রেখে বসল। বটা সান্যাল তার দিকে তাকিয়ে থাকলেন। উপেন বুঝতে পারছিল সান্যাল তাকে দেখছেন না, তবু বলে চললো—"বাবু, যুদ্ধটা বেশ জোরই লাগে বলে পসন্দ হয়। সংবাদপত্রের বিবৃতিতে মনে হয় প্রায় গরু-খেকো বাঘের মতো চীনাগণ উদ্যত। তবে সব বোধহয় সত্যি নয়—"

"কী উপেন, বুড়ো বয়সে কী জেল খাটবার ইচ্ছে হয়েছে ?"

"কেন বাবু ?"

"এই যে বলছ, খবরের কাগজের সব কথা সত্যি নয়—"

"না না ছি ছি বাবু, কলিকালের ভাগবত হচ্ছে সংবাদপত্র, তাকে অবিশ্বাস করার ন্যায় মহাপাপ ছি ছি—"

"হ্যাঁ, তোমার এতো কথা বলার বদভ্যাস, যে কবে যে জেলে যাও—"

"তা গেলে যাব বাবু, আপনাদের শ্রীচরণের আশীর্বাদে উপেনের চলে যাবে। আর যদি জেলেই যাই তবে পাপী-তাপী—কমিউনিস্ট চোর ডাকাতগণকে ইষ্টনাম শোনাতে পারব—দেখবেন, ওখানেও আমি অষ্টপ্রহর করবো—"

"এই বিশ্বনাথ, বিশ্বনাথ" আবার বিশ্বনাথ এসে দাঁড়ালো, "যা তো মন্টুবাবুকে ডেকে নিয়ে আয় তো"—বিশ্বনাথ চলে গেলে উপেনের দিকে তাকিয়ে সান্যাল বললেন, "দেখো উপেন, তুমি না ইলেকসনের সময় কমিউনিস্ট ছিলে, এখন আবার—"

"বাবু, ঐ-টাই একটু রহইস্ত"

"কী উপেন, তোমার আবার রহইস্ত কি?" নারায়ণবাবু এসে বেঞ্চে বসতে বসতে বললেন।

"রহইস্তটা হচ্ছে এই যে কৃষ্ণ মেনন, দেশরক্ষা মন্ত্রী ছিলেন, তাঁকে অপসারণ করবার পক্ষে কী যুক্তি ছিল? না, তিনি প্রচ্ছন্ন কমিউনিস্ট, কী বাবু, তাই না?"

"তুমি দেখি সাংঘাতিক পণ্ডিত, তা হলোই বা, তাতে কি?" নারায়ণবাবু বললেন।

"হলোই বা কি বাবু, বলুন আমার কথা ঠিক কি না, কৃষ্ণমেনন কংগ্রেসের মধ্যে প্রচ্ছন্ন কমিউনিস্ট, ঠিক কি না—"

"যা যা বক্‌বক্ করিস না—" বটাসান্যাল এবার বিরক্তি প্রকাশ করলেন, "তোর অতসব দিয়ে দরকার কি?"

"দরকার আছে বাবু বলেন বাবু, আপনি বলেন, ঠিক কি না—"

"তুই যা তো উপেন—" আবার ধমক দিলেন বটাসান্যাল। উপেন বলল—"আপনি আগে বলেন বাবু", বলে নারায়ণের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

"বললাম তো হ্যাঁ" নারায়ণবাবু বললেন। সম্মুখ দিয়ে এক চাকর যাচ্ছিল তাকে বটাবাবু বলে দিলেন, "এককাপ চা দিয়ে যাস্ তো—"

"এই দেখুন, আপনি এখানকার কংগ্রেসের নেতা, আপনিও এরূপ বললেন।

তাহলে কংগ্রেসের মধ্যে যদি প্রচ্ছন্ন কমিউনিস্ট থাকতে পারে, কমিউনিস্টের মধ্যে প্রচ্ছন্ন কংগ্রেসী থাকতে পারবে না কেন? আমি কমিউনিস্টের মধ্যে সেইরূপ প্রচ্ছন্ন কংগ্রেসী ছিলাম, নির্বাচনের সময়—"

"আচ্ছা হয়েছে হয়েছে, তোমার ঐ যাত্রাদলের বিবেকের মতো কথাবার্তাগুলি থামাও তো। ব্যাটা একেবারে বাংলার প্রোফেসর। যা এখন, কাজ আছে—" বটাসান্যাল উপেনকে থামিয়ে দিলেন।

"বাবু, যে কারণে আসা, সেইটি নিবেদন—"

"নিবেদন করতে হবে না, বল—"

"গত বৎসর শীতকালে নবগ্রহ সম্মেলন উপলক্ষে কমিটি করলেন, সপ্তশতী যজ্ঞ করলেন, আমরা একমাসব্যাপী অষ্টপ্রহর কীর্তন গেলাম। এবার কি কিস্থই হবে না বাবু?"

নারায়ণবাবু হেসে উঠলেন। বটাসান্যাল বললেন—"যা, যা, এখন ওর কীর্তন গাইবার সময়,—যেদিন বোম পড়বে, সেদিন বুঝবে—"

বিশ্বনাথ যাকে ডাকতে গিয়েছিল সেই মন্টুবাবু এসে দাঁড়িয়ে ছিলেন, একটু দূরে। তার দিকে তাকিয়ে বটা সান্যাল বললেন "এরিয়ার বিলের ফাইলটা একটু আনুন তো।" মন্টুবাবু অদৃশ্য হলেন।

"সেটাই তো সমস্যা বাবু, লোকে আপনার নামে নিন্দাবাক্য করবে তা শোনার আগে যেন আমার দেহরক্ষা হয়—"

বটাসান্যাল বুঝলেন উপেনকে নিরস্ত করা যাবে না। একটা পা বেঞ্চির ওপর তুলে বললেন, "ব্যাটা পণ্ডিত—"

উপেন বলে চললো—"বাবু, কুলোকে কুকথা বলবে যে—গতবছর যুদ্ধ নাই, দাঙ্গা নাই, বন্যা নাই, আগুন নাই, তবু সান্যাল মশাইয়ের দল অষ্টপ্রহর করল শান্তির জন্য—আর এইবার যে এতো যুদ্ধ, এতো দাঙ্গা, এতো হত্যা—সান্যাল মশাইয়ের কমিটির দেখাই পাওয়া যায় না—সে আমার সহ্য হবে না—"

"ওঃ সহ্য হবে না—সান্যাল মশাইয়ের দল! আমি তোদের অধিকারী, না?—"

"বাবু আপনি ঢাকী, আমরা ঢাকের চামড়া। যাক্ বাবু, আমি উঠি, আপনি তো বললেনই বাবু এ অধম যাত্রাদলের বিবেক। আপনাকে সব জানিয়ে যাওয়া আমার কর্তব্য।" দুই হাত মাথার ওপর তুলে আড়মুড়ি ভাঙতে-ভাঙতে বলল—"তাছাড়া বাবু এই শীত—সারাদিন কাজকর্মের

শেষেও সারারাত গান গাই, শরীরটা ওম্ থাকে, দশে মিলে রাত জাগতে কোনো ব্যথা লাগে না, আর বাড়িতে যে কাঁথাটা বাঁচে সেটা কেউ গায় দিতে পারে, আপনারা হাত ঝাড়লে বাবু, আমাদের কোঁচর ভরে যায়—"

"তা মাড়োয়ারিদের কাছে যা না, ওরা যদি চাল দেয়, বাকি খরচ না হয়—"

"বাবু চালের মন সাড়ে তিরিশ, আজ সকালে, কাল বিকালে ছিল আটাশ বারো—এই বাজারে কেউ চাল দেয় ?"

"আরে ব্যাটা সবার কাছে তাড়া খেয়ে আমার কাছে এসেছ—"

"আপনিও তো তাড়িয়েই দিলেন বাবু—ভেবে দেখেন, সংবাদ দেবেন দরকার হলে, একটা অষ্টপহর জমতো কিন্তু খুব বাবু, ধরেন, মোটে সাতদিন।"

"যা যা" বটা সান্যাল নারায়ণের দিকে তাকালেন। উপেন বোধহয় গেল। "নারায়ণবাবু, আপনারা বিপদ বাড়াচ্ছেন। আপনি কংগ্রেসের এ রকম একজন লোক হয়ে ফট্ করে বলে দিলেন যে মেনন—" বটাসান্যালকে বাধা দিয়ে নারায়ণবাবু বললেন—"রাখুন, ও ব্যাটা মনে রাখতে গেছে—" "আপনি নাপিতের বুদ্ধির কাছে হেরে গেলেন মশাই। ও যতই অষ্টপ্রহর কেত্তন গান করুক আর আপনার আমার কাছে এসে বক্তৃতা মারুক ওদের কলোনিতে ও এক মস্ত পাণ্ডা—"

"আচ্ছা, কমিউনিস্ট-ই হোক্ আর যাই হোক্, এখন আর তেল খাটানো চলবে না, আর মশাই দেশের লোককে তো অত বোকা ভাবলে চলে না, মেনন সত্যিই অন্যায় করেছে, বলেছে, তাকে সরিয়েছি আমরা। দেশের থেকে তো একজন মানুষ বড় নয় মশাই। সে নেহেরু-ই হোক্ আর যাই হোক্—"

"থামুন মশাই থামুন, আপনি আমার সঙ্গে এ সব কথা বলবেন না। এরপর তো বলবেন পাকিস্তান ব্রিটেন আমেরিকার সঙ্গে আরো কষে জড়িয়ে পড় এই তো। আপনাদের কী মশাই। আমাদের কাছ থেকে চাঁদা নিয়ে পলিটিক্স করছেন, তখন আর কারো কাছ থেকে চাঁদা নিয়ে করবেন। জানেন" হোঁচট খেয়ে থামলেন বটাসান্যাল, তারপর বললেন, "জানেন কলকাতার এক ভদ্দরলোক আমাকে চিঠি লিখে জানিয়েছে যে তাদের কোম্পানিকে আর ব্যাঙ্ক টাকা দিচ্ছে না,—অথচ ব্রিটিশ কোম্পানি টাকা ঠিকই পাচ্ছে—"

"তা ব্যাঙ্কের-ব্যবসা, ব্যাঙ্ক বুঝবে—যেখানে লগ্নী ধরলে—"

"বাদ দেন, বাদ দেন, ব্যবসা-পত্র তো আর করছেন না, কী করে বুঝবেন কী ব্যাপার, বলেন—"

"আপনাকে একটা খবর দিতে এসেছিলাম।"

নারায়ণবাবুর কথা বলার ভঙ্গিতে আকৃষ্ট হলেন বটাবাবু।

"পরশুদিনের পরদিন তো মিটিঙ, মানে শুক্রবার" বটাসান্যালের মনে পড়ল এই শুক্রবারের ব্যাপার নিয়ে সকাল থেকে, পে-ডে, ইত্যাদি, "তা মিটিঙটা ঠিক কংগ্রেসের নামে করা ঠিক হবে না। সবাই মিলে হচ্ছে এইরকমভাবে করাই এখানকার সিচুয়েশনে উচিত হবে। সুরেনদা, নিমাইদা, ভোলাবাবু—এঁদের সবারই এই মত। সেজন্য আমরা নিজেরা ঠিক করেছি চার-পাঁচজন মোটামুটি নাগরিক গোছের লোক নিয়ে মিটিঙটা আহ্বান করব।"

"নিমাইদার সঙ্গে তো আমার আজ সকালেও কথা হয়েছে, উনি তো কিছু বললেন না—"

"না, একটা ব্যাপার আছে। মানে কে কে সভার কনভেনর হবে তা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। দুটো পরামর্শ আছে। একজন মাড়োয়ারিকে, এবং অন্য পার্টির মোটামুটি একজনকে রাখতে হবে। সেটা ঠিক হয়েছে শর্মা আর ফনিবাবু। এখন আমাদের মধ্যে কে কে যাবে? কেউ কেউ বলছিলেন নিমাইদা আর ভোলাবাবু-র নাম দিতে। তাতে, কারো কারো, ধরেন আমারও, আপত্তি। মানে ভোলাবাবু আর নিমাইদা দু-জনই কংগ্রেসের সঙ্গে এতো জড়িত যে আমরা যেটা করতে চাইছি—সেটা ঠিক হবে না। সেজন্য আমরা বলছিলাম, আপনি আর ভোলাবাবু যদি হন তবে সব দিকই রজায় থাকে—"

বটা সান্যাল সোনার দোকানির মতো ওজন করে কথাগুলো শুনলেন। কিন্তু পুরনো রীতিতে ধাতস্থ দোকানীর মতো নতুন রীতির হিসাবনিকাশে কী রকম বেসামাল হয়ে পড়লেন। চীন-ভারত যুদ্ধের মতো একটা ঘটনায় মিটিঙ হবে, সেই মিটিঙে তাঁকে কনভেনর করতে চাইছে। অথচ গেল বছর একটা স্কুল কমিটির মেম্বার হতে চেয়েছিলেন তিনি, নমিনেশনই পেলেন না। কবে ছ, সাত, কী আট বছর আগে মিউনিসিপ্যাল কমিশনারের নমিনেশন পেয়েছিলেন, তাতে গু-হারা হেরেছেন। এখন এরা এতো···বটা সান্যাল সন্দিগ্ধ হলেন। শর্মা, ফনিবাবু, ভোলাবাবু, এই তিনজনের নামের সঙ্গে তার নাম আসতেই পারে না, অথচ···। তাহলে ব্যবসায় তারও লাভ হচ্ছে এই সময়।

"দেখুন, নারায়ণবাবু, আমাকে একটু ভেবে দেখতে হবে—আচ্ছা

আপনি একটু বসুন, আমি আসছি," বলে উঠে দাঁড়িয়ে যেতে যেতে জিজ্ঞাসা করলেন—"কে কে বক্তৃতা করবে?"

নারায়ণবাবু চারজনের নাম বললেন। "এদের মধ্যে কংগ্রেস কে মশাই?"

"আরে ঐ হলো। বোঝেন সবই। এরা তো কংগ্রেসই ছিল বা রিটায়ার্ড গবমেণ্ট..."

বটা সান্যাল চলে গেলেন। যেতে যেতে ভাবলেন নারায়ণবাবু টের পেয়েছেন যে তিনি নিমাইবাবুকে ফোন করতে যাচ্ছেন। টের পাক। নিমাইদাকে না জিজ্ঞাসা করে তো আর রাজি হওয়া চলে না।

"হ্যালো। নিমাইদা। হ্যাঁ, আমি বটা। শুনুন, নারায়ণবাবু এসে বলছেন পরশুদিনের কী একটা মিটিঙ হবে না, ওতে ভোলাবাবু, শর্মা, আর ফনিবাবুর সঙ্গে আহ্বায়ক হতে" তারপর চারটি নাম করে বললেন—"এঁরা বক্তৃতা দেবে—"

"......।" অপর পক্ষের রিসিভার নামাবার শব্দের পর বটাসান্যাল রিসিভার নামিয়ে রাখলেন। নিমাইদা বললেন রাজি হতে। তারপর সেই ফোনের ওপর হাত রেখে মিনিট কয়েক ভাবলেন, এই পদের জন্য এতো সব বড় বড় প্রার্থী থাকতে তাকেই পদস্থ করার পেছনে কী কোনো অভিসন্ধি আছে, বোকা বলে নিজের মহলে তার দুর্নাম আছে, অন্যেরা বুদ্ধিবলে যে পদের বিপদ এড়িয়ে যাচ্ছে তিনি কি বুদ্ধিদোষে সেদিকেই যাচ্ছেন। বটাবাবু একটু দ্বিধা সঙ্কোচে পড়লেন। ভেতরে বাথরুমে গেলেন। ফেরার সময় দেখেন ছোটমেয়ে কলে হাত ধুচ্ছে। "এই বেণু, ধর্ তো" বলে দুটো আঙুল মেলে দিলেন, মেয়েটি একটি ধরল। হ্যাঁ। বাইরে যেতে যেতে বটা সান্যাল ভাবলেন যে নিমাইদা রাজি হতে বলেছেন, এখন রাজি না হলে নিমাইদা খেপে যাবে, এদিকে ভয়ও করছে।

"আমাকে এ সব প্রত্যক্ষ রাজনীতির মধ্যে না আনলেই পারতেন নারায়ণবাবু। গেলবার সপ্তশতী যজ্ঞ কমিটির সেক্রেটারি হতে আমার তো কোনো আপত্তি ছিল না। আসলে ধর্মকর্মের কাজ নিয়েই থাকতে ভালোবাসি।"

"আরে মশাই, এও তো ধর্মকর্মের মতোই, স্বর্গাদপি গরীয়সী, কই চা দিতে বললেন—"

"এই চা দিয়ে যা" চিৎকার করলেন বটাসান্যাল "তা যান, নামটা লাগিয়ে যা করার করবেন, তবে দেখবেন মশাই,"

"আচ্ছা-আচ্ছা, কাজ আর কী, বিকেল নাগাদ কিছু পোস্টার সিনেমা হাউসের ঐ যারা পোস্টার লাগায় তাদের দিয়ে দেব, আর কিছু লিফলেট আর মাইক দিয়ে ছেলেছোকরাদের লাগিয়ে দেব। তবে শুক্রবারদিন সকালে গাড়িটা লাগবে"

"গাড়িটা আবার শুনছিলাম খারাপ আছে—এই বিশ্বনাথ বিশ্বনাথ—"

কম্বল মুড়ি দিয়ে বিশ্বনাথের আগমন, "গাড়িটা কি চলবে?"

"না খারাপ আছে, ও-সব ঠিকঠাক করতে হবে," ইঙ্গিত বুঝে কথা বলে বিশ্বনাথ যোগ করে দিল "দু চারদিন লাগবে—"

"তা তিনদিন তো এখনো হাতে আছে, লাগবে তো শুক্রবার সকালে" বলে উঠে নারায়ণবাবু "চলি এখন, ও চা আর আসলো না আজ" বলতে বলতে চললেন। বিশ্বনাথ একদৃষ্টিতে খানিকক্ষণ বটাবাবুর দিকে তাকিয়ে থেকে চলে গেল।

মণ্টুবাবু-র অভ্যাস আছে প্রয়োজনের সময় ছাড়া অদৃশ্য অথচ ঘনিষ্ঠ থাকার। সুতরাং নারায়ণবাবু-র প্রস্থানের পর তিনি একটা ফাইল নিয়ে এসে দাঁড়িয়ে থাকলেন। কাজটা এখনই না চুকিয়ে ফেলতে পারলে এরপর বটাবাবু স্নানাহার করতে যাবেন, অর্থাৎ বেলা দেড়টা বাজবে। একটা অবশ্য বিকল্প ছিল এই যে, মণ্টুবাবু একেবারে খাওয়া দাওয়া সেরে আসতে পারতেন, কিন্তু দুপুরের খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেলে যৌগিক আসন করতে করতে স্মৃতিকথা বলার এক অভ্যাস আছে বটাবাবু-র, পারতপক্ষে তার পাল্লায় কেউ পড়তে চায় না। কিন্তু ফাইল নিয়ে এসে বটাবাবুকে যেরকম তন্ময় হয়ে বসে থাকতে দেখলেন, তাতেই খানিক আত্মস্মৃতির ভাব দেখে প্রমাদ গণলেন। সেই কারণেই ফাইলটা নিয়েই একেবারে হুমড়ি খেয়ে পড়লেন মণ্টুবাবু—"বটাদা, এরিয়ার তো সবার নামেই আছে—"

"অ্যাঁ? সবার নামেই বিল করুন, হ্যাঁ, সবার নামে"

"ভারতী, মংলাঝোড়া, সিম্‌সিম্—এদের নামেও?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ সবার নামে।" এরপর খানিকক্ষণ নীরবতা। বটাবাবু-র লুব্রিকেটিং তেল, মেশিনারির স্পেয়ার পার্টস, এবং স্টেশনারি জিনিসপত্র সরবরাহের ব্যবসা আছে। বটা সান্যাল ব্যবসায়ী, ব্যবসায়ী কথাটির সংজ্ঞা যদি এই হয় যে দুই পক্ষের মধ্যে যোগাযোগ ও অন্যের প্রয়োজনে নিজেকে অপরিহার্য করে তোলার জাঁতাকলে পিষে রস বের করা। তার এই ব্যবসায়ী

চরিত্রটি যখন শিল্পপতিত্বের সঙ্গে যুক্ত হয়, তখন তাঁকে প্রায় তান্ত্রিক পুরাণ বর্ণিত সেই উদ্ভট দেবতাদের মতো মনে হয় যারা নিজের মুণ্ডু নিজে চিবিয়ে, সেই চর্বিত-অংশ দিয়ে নতুন মুণ্ডু বানিয়ে আবার তা চিবোয়—এবং এইভাবে স্বমুণ্ড-চর্বন এবং স্বমুণ্ড-নির্মাণের চক্রাকার খেলা খেলতে থাকে। অর্থাৎ ডুয়ার্স অঞ্চলের সমস্ত চা-বাগানের তেল, স্পেয়ার পার্টস ও স্টেশনারি দ্রব্যাদির একমাত্র সরবরাহকারী হচ্ছে সান্যাল এ্যাণ্ড সন্স, যার ডিরেক্টর হচ্ছেন বটা সান্যালের কলেজ পাঠরত পুত্র, বড় কন্যা, এবং স্ত্রী। বটাসান্যাল সব কোম্পানিকে বাকি টাকা শোধ করার চিঠি দিচ্ছেন। মুশকিল বাধলো যে তিনটি কোম্পানির নাম মণ্টুবাবু করলেন তাদের নিয়ে। ওগুলো নিমাইদার। নিমাইদা যদি বুঝে ফেলেন চারপাশের অবস্থা বুঝে বটা সান্যালও নিজেকে সামলাচ্ছে। ঐ তিনটি কোম্পানীর বিশ বিশটা বাগান, তাছাড়া নিমাই ঘোষের সঙ্গে দড়ি বেঁধে-ই এতোদূর পর্যন্ত এসেছেন বটাসান্যাল। বটা সান্যাল উঠলেন, “রায় ঝোড়াকেও দেবেন” বলে ভের্তরের দিকে রওনা হলেন। রায় ঝোড়া

সান্যালের নিজের বাগান।

ঘণ্টা দুই পরে মণ্টুবাবু ফাইল নিয়ে বটাবাবুর অপেক্ষায় বাইরের ঘরে বসে ছিলেন। বটাবাবু-র খাওয়া হয়েছে, এইবার একটি পান খেয়ে এবং সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে তিনি এসে বিরাট সোফাটার ওপর বসবেন। এবং তারপর বটা সান্যালের জীবনী, আন্তর্জাতিক রাজনীতি. ভারতীয় আধ্যাত্মিকতা ইত্যাদি বিষয়ে সান্যাল-মুখাৎ বাণী শ্রবণ করে বাড়ি ফিরতে ফিরতে কমপক্ষে আড়াইটা তিনটে, আবার আসতে হবে সন্ধ্যাবেলায়।

যে ঘরে বসে সকালবেলায় বটাসান্যাল ফোন করছিলেন, সেই ঘরেই মণ্টুবাবু বসে।

ঘরটা বেশ বড়, কিন্তু, বিরাট একটি সেক্রেটারিয়েট টেবিল, একটি বিরাট সোফা, দুটি কৌচ, এবং চারটি ছোট টেবিলের ভিড়ে ঘরটিকে ছোট দেখায়। ঘরের দেয়ালগুলি পনের ইঞ্চির। ছিল একটি মুসলমান বাড়ি, দাঙ্গার পর সান্যাল পঞ্চাশ হাজার টাকায় কিনে নেন। পেছনে বিরাট জমি। সামনে বড় রাস্তার ওপরের দোকানপাট থেকে মাসে প্রায় হাজার টাকার ওপর ভাড়া পান। বাড়িটি কেনার পর প্রচুর শান্তি স্বস্ত্যয়ন ও সংস্কার হয়েছে, কেননা দাঙ্গার সময় এ বাড়িতে একটি শিশু ও একটি বৃদ্ধাকে খুন করা হয়। বহু পরিবর্তনের পরও বাড়িটার বাইরের চেহারায় কোনো বদল আসে নি।

বাইরের এই ঘরটার দেয়ালে, জানলা দরজার ওপর, কয়েকটা ছবি। একটি রামকৃষ্ণ পরমহংসের ; একটি ছবি নেতাজীর—প্রাচীনকালের বীরগণের মতো আকৃতি, কোমরে তলোয়ার ; একটি ছবি সান্যালের মৃত পিতার তৈলচিত্র, মূল্য একশত সত্তর টাকা, একটি ছবি সান্যালের মৃত ভ্রাতার তৈলচিত্র, মূল্য একশত বিরাশি টাকা ; দুটি ছবি—একজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর সঙ্গে নিমাই ঘোষ এবং উভয়ের মাথার ফাঁকে পশ্চাদ্বর্তী বটা সান্যালের উৎকণ্ঠ মুখ ; একটি ছবি—সান্যালের জামাতার। দরজায় পর্দা ঝুলছে কুঁকড়ে মুকড়ে, তেলচিটে ও বিবর্ণ।

বটা সান্যাল প্রবেশ করলেন, “কী খবর মণ্টুবাবু?” যেন মণ্টুবাবুকে তিনি আশাই করেন নি। বটা সান্যাল সোফার ওপর বসলেন, তারপর বীরাসন হলেন, তারপর হাত বাড়িয়ে প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে ধরালেন। এখন বটা সান্যালের সম্মুখে দেয়াল, পেছনে মণ্টুবাবু, এবং সান্যাল ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঐ ভাবে কথা বলবেন, মণ্টুবাবুকে শুনতে হবে, হুঁ দিতে হবে। মণ্টুবাবুর বহুদিন ইচ্ছে হয়েছে বলে, কথা বলতে হলে এদিকে মুখ করে বসুন।

মণ্টুবাবু হাত বাড়িয়ে দিলেন, বিল। সিগারেট ধরা আঙুলের সঙ্গে বুড়ো আঙুল জড়ো করে কাগজগুলো ধরলেন সান্যাল। মণ্টুবাবু পেন খুলে এগিয়ে দিলেন, সান্যাল ধরলেন, মণ্টুবাবু মুহূর্তের জন্য ভাবলেন জীবনীটা বোধহয় আর শুনতে হলো না, কিন্তু সান্যাল পেনটা খোলা অবস্থাতেই পাশের ছোট টেবিলে নামিয়ে রেখে প্রথম বিলটার ওপর চোখ বোলালেন—“বুঝলেন মণ্টুবাবু, এই শহরে জন্মের পর থেকে আছি, পঞ্চাশ বছর, কতো দেখলাম।” মণ্টুবাবু গিয়ে পেছনের সোফায় বসলেন। সাহস থাকলে চোখ বন্ধ করতেন ; মুখস্থ হয়ে গেছে মণ্টুবাবুর, খুব দরিদ্র, বাবা ক্লার্ক, দাদা, মৃত ছবির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ, পড়াশুনা, কলকাতা, বি. এ, ব্যবসা, চাকরি, ব্যবসা, চাকরি, দশবৎসর পর এই শহরে প্রত্যাবর্তন—

“এটা আমার প্রতিজ্ঞা ছিল মণ্টুবাবু যে এই শহরে যদি কোনোদিন ফিরি গাড়ি নিয়ে ফিরব। আর ফিরেওছিলাম তাই। শুরু করেছিলাম একটা ছোট্ট এজেন্সি নিয়ে, পাঁচ বছরের মধ্যে এখানে তো একটা ব্রাঞ্চ খুলতে পারলাম—বলুন”

ইন্‌সিওরেন্স। ইন্‌সিওরেন্সের ব্যবসা দিয়ে শুরু করেছিলেন বটা সান্যাল।

ব্রাঞ্চ। লাইফ। মোটর, ফায়ার। নিমাই ঘোষ। ঘোষ কনসার্নের লেজুড় হয়ে এখন মোটর-ফায়ার ইনসিওরেন্স, তেল-মেশিনের সাপ্লাই, চা-বাগান—এই তিনদিকের ব্যবসা।

"সেদিন আমাকে কেউ পাত্তা দেয় নি মণ্টুবাবু, আর আজ পরশুদিন যে পাব্‌লিক্ মিটিঙ হবে তার কন্‌ভেনর করতে আসে আমাকে ?"

"আপনি কি পরশুদিনের মিটিঙের কন্‌ভেনর হয়েছেন—"

"হ্যাঁ,"

"আর কে কে ?"

বটাসান্যাল বললেন, এবং বলতে বলতে বিকেলে দেয়ালে-দেয়ালে তাঁর নাম-ছাপা পোস্টার মনে মনে দেখলেন। চারজনের মধ্যে তাঁর নামটাই সবচেয়ে শেষে দেবে বোধহয়, তা দিক।

"কেন ?"

"না, এমনি।" মণ্টুবাবু এসে সামনে দাঁড়ালেন।

"কিছু শুনেছেন নাকি ?"—মণ্টুবাবু দেখলেন এই লোকটি হাতে কাজের কাগজপত্র নিয়ে কতো অন্যমনস্ক হবার ভান করছে। অথচ এতোক্ষণ প্রত্যেকটি বিলের প্রত্যেকটি অঙ্ক খতিয়ে দেখেছে। এবং এখন মণ্টুবাবুর কাছ থেকে কিছু তোষামোদ শুনতে চায়। মণ্টুবাবুর কী রকম প্রতিশোধ স্পৃহা জাগলো।

"না, শুনব আর কি ? ক-দিন ধরেই শুনছিলাম চেষ্টা হচ্ছে, তবে, আপনার কাছে আসবে ভাবি নি—"

বীরাসন থেকে নেমে এলেন বটা সান্যাল। বিল কয়টি অতিক্রত সই করে জিজ্ঞাসা করলেন, "কী শুনেছেন।"

এতো দ্রুত লোকটি সেই হাতের কাজ সেরে নতুন কাজে ঢুকল,—দেখে মণ্টুবাবুর ভালো লাগল। বিলগুলো গুছোতে-গুছোতে বললেন—"না, তেমন কিছু নয়, এখন তো অবস্থা খুব গোলমেলে, কে কী করবে ঠিক বুঝতে পারছে না। শুক্রবারের মিটিঙে যারা বক্তৃতা দেবে তারা তো কংগ্রেসের নন, অথচ কংগ্রেসের। এ মিটিঙে না থাকলে ক্ষতি হতে পারে, থাকলেও ক্ষতি হতে পারে ; না-থাকলে ভালো হতে পারে, থাকলেও ভালো হতে পারে। মানে অনেকে ভাবছেন, এরাই শেষে কংগ্রেসের নেতা হবে, আবার অনেকে ভাবছে এদের গোলমাল থামলেই গবমেণ্ট শাস্তি দেবে। তাই কেউ-ই সরাসরি

থাকতে চান না। শর্মা আর ফনিবাবু তো কংগ্রেসের বাইরে, ওঁদেরই দলের। তাই ওঁরা রাজি হয়ে গেছেন। নিমাইবাবু রাজি হন নি এটা তো আগেই জানা গেছে। ভোলাবাবু রাজি হয়েছেন সেটা আজ সকালে শুনলাম—"

"এতো ব্যাপার নাকি ? তবে আমাকে কেন ?"

"মানে, আপনি থাকলে নিমাইবাবুর সম্মতি আছে এটা বোঝা যায়—"

"হুঁ" সান্যাল মণ্টুবাবুকে থামিয়ে দিলেন। পুরো ব্যাপারটা এতোক্ষণে তাঁর বোধগম্য হয়েছে। মণ্টুবাবু কাগজগুলো হাতে নিয়ে প্রস্থানোদ্যত হয়ে বললেন, "গুড্‌ইয়ার কোম্পানির খবর শুনেছেন নাকি ?"

"কাল রাত্রিতে নিমাইদা বলছিলেন ওরা নাকি বেচবে না জানিয়েছে—দেখুন না একটু ফোন করে।" ফোনের দিকে এগোলেন মণ্টুবাবু, "আচ্ছা থাক্। আপনি যান্, বিলগুলো পাঠিয়ে দিন—"

মণ্টুবাবুর প্রস্থানের পর রিসিভার তুলে একটা নম্বর চাইলেন।

"হ্যালো, আমি সান্যাল বলছি, আচ্ছা, ঐ গুড্‌ইয়ার ট্রানজাকশনের কী হয়েছে বলতে পারেন ?"

"………।"

রিসিভারটা নামিয়ে ধীর গতিতে এসে সোফায় বসলেন বটা সান্যাল। এই ভয়টাই তিনি পাচ্ছিলেন। গুড্‌ইয়ার কোম্পানি-র একটা বাগান বিক্রি ফাইন্যাল হয়ে গিয়েছিল, দু-একদিনের মধ্যে রেজিস্ট্রেশনের কথা, সেটা ক্যানসেল্‌ড্ হয়েছে, অর্থাৎ গত ন-বৎসর ধরে ধীরে ধীরে সাহেব কোম্পানি-গুলো যে বাগান বেচে দিচ্ছিল, তা বন্ধ হলো, সাহেবরা আঁরো জাঁকিয়ে ব্যবসা করবে। নিমাইদা আর ভোলাবাবু-র বাগান বাদে আর সব বাগানে টাকা দেওয়া ব্যাঙ্ক বন্ধ করেছে। বেয়াল্লিশ সাল থেকে নিমাইদার সঙ্গে ব্যবসা, আজ নিমাইদা যেন ছেড়ে দিচ্ছেন বলে মনে হচ্ছে। অর্থাৎ এ-রকম চললে নিমাইদা বা ভোলাবাবুর একজন তার বাগানটা কিনে নিতে চাইবেন। সেইজন্যই ভোলাবাবু নিজের সঙ্গে বটাসান্যালের নাম যোগ করেছেন। সেইজন্যই নিমাই ঘোষ নিজের নামের বদলে বটাসান্যালকে বেচে দিয়েছেন। আর বটা সান্যাল দেখলেন তার নিজের হাতে একটা ছুরি, নিজের বুকে তিনি মারছেন, কিন্তু তাঁর হাতটা ধরে তাঁরই বুকের দিকে ঠেলে দিচ্ছেন নিমাই ঘোষ, ভোলাবাবু আর দুইজনের সন্নিহিত মুখের পেছনে উৎকণ্ঠ ও সহাস্য একটি সাহেবের মুখ। বটা সান্যাল ছুরিটা ভোলাবাবু, নিমাইদা আর সাহেবটার দিকে যদি না ঘোরান তাহলে তাঁর অবধারিত মৃত্যু।

মণ্টুবাবু ও উপেন নাপিতের কথা বটা সান্যালের মনে পড়ল। তারা বোধহয় ছোরাটা ঘোরাতে সাহায্য করতে পারে।

কনস্টানটিন সার্গেভিচ স্ট্যানিস্লাভস্কি স্মরণে

প্রভাতকুমার দত্ত

গত ১৭ই জানুয়ারি রাশিয়ার অবিস্মরণীয় নাট্যপ্রতিভা স্ট্যানিস্লাভস্কির জন্মের একশত বৎসর পূর্ণ হয়েছে। সংস্কৃতিপ্রেমিক বিশ্বের প্রতিটি মানুষের কাছে এটি বিশেষ আনন্দের দিন। কারণ স্ট্যানিস্লাভস্কি এমন একটি প্রতিভা যাকে বিশ্বজনীন ছাড়া আমরা আর কিছু নামে অভিহিত করতে পারি না। তাঁর অবদান শুধু যে রাশিয়ার মঞ্চকেই সমৃদ্ধ করেছে তাই নয় বিশ্বের প্রতিটি অগ্রসর দেশের মঞ্চই তাঁর দ্বারা লাভবান হয়েছে। আমরা যাকে 'স্ট্যানিস্লাভস্কি সিস্টেম' বলি তা কেবলমাত্র রুশদেশে নয় ইংলণ্ড, ফ্রান্স, আমেরিকা, জার্মানি প্রতি দেশেই অনুসৃত হতে দেখছি। এখানে কমিউনিজম-ক্যাপিটালিজমের কোনো প্রশ্নই ওঠে না। নাটকের কতকগুলি মূলগত সমস্যার উপর স্ট্যানিস্লাভস্কি তাঁর তীব্র সন্ধানী মনের আলোকপাত করেছিলেন যা সবকিছু মতবাদের উর্ধ্বে। তিনি তাঁর আত্মজীবনীতে একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। তিনি বলছেন আমরা God save the Tsar কিম্বা Internationale যে সংগীতই করি না কেন আমাদের দেখতে হবে গানগুলি সুগীত হচ্ছে কিনা, গায়করা ঠিকমতো স্বরসাধনা করেছেন কিনা, গানকে প্রাণবন্ত করার মতো দক্ষতা তাঁদের আছে কিনা। স্ট্যানিস্লাভস্কি 'সিস্টেম' সম্পর্কেও ঠিক সেই কথা। এই 'সিস্টেম' সৃষ্টি সুঅভিনয় এবং নাটক সার্থকভাবে মঞ্চস্থ করার জন্য। বিশ্বের যে কোনো প্রান্তের নবীন অভিনেতা ও নাট্য প্রযোজকদের নিজেদের যথার্থ প্রস্তুত করে তোলার জন্য এই সিস্টেমের চর্চা অপরিহার্য। তাই আজকাল লণ্ডন, নিউ ইয়র্ক, প্যারিস প্রতি স্থানেই 'স্ট্যানিস্লাভস্কি স্কুল অফ্ ড্রামার অস্তিত্ব দেখতে পাচ্ছি। সেইজন্যই আমরা বলছিলাম রুশ নাট্যগুরুর প্রতিভা সেক্সপীয়ার, গ্যেটে, রবীন্দ্রনাথের মতো বিশ্বজনীন ও সর্বকালীন।

স্ট্যানিস্লাভস্কি তাঁর প্রতিভা জন্মসূত্রে পেয়েছিলেন এমন যদি আমরা মনে করি তাহলে বিশেষ ভুল করা হবে। প্রতিভা বাইরে থেকে

তৈরি করা জিনিষ একথা তিনি অলীক বলে মনে করতেন। মস্কো আর্ট থিয়েটারে নাট্য-প্রযোজনায় স্ট্যানিস্লাভস্কি একথা বার বার স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন যে, জন্মসূত্রে কোনো বিশেষ গুণ নিয়ে জন্মগ্রহণ করুন আর নাই করুন, প্রত্যেককেই নিজের প্রতিভার স্ফুরণের জন্য কঠোর অনুশীলনের মধ্য দিয়ে যেতে হবে। তাই আর্ট থিয়েটারে নামী-অনামী প্রত্যেক অভিনেতাকেই রিহার্সালে সমানভাবে অংশগ্রহণ করতে হতো। স্বভাবদত্ত প্রতিভার মধ্যে অনেক আলগা ও অস্পষ্ট জিনিস থাকে। অভিজ্ঞতার কষ্টিপাথরে তা শাণিত না হলে সে জিনিস পরিণত প্রতিভারূপে গণ্য হতে পারে না। স্ট্যানিস্লাভস্কি যে 'সিস্টেম' দিয়ে গেছেন তা তার সারা জীবনের গভীর সাধনার ফল। তিনি জন্মেছিলেন ১৮৬৩ সালে যখন রাশিয়ায় দাসপ্রথার প্রভাব একেবারে অপসৃত হয় নি; ১৯৩৭ সালে যখন তিনি মারা যান তখন রাশিয়া সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথে অনেকটা অগ্রসর। স্ট্যানিস্লাভস্কি তাঁর আত্মজীবনীতে বলেছেন: "From the lard candle to the electric searchlight, from the tarantas to the aeroplane, from the sailboat to the submarine, from the pony express to the radio, from the flinthook to the Big Bertha, from bolshevism and communism, I have lived an interesting life in an age of changing values and fundamental ideas." এই interesting life-ই হচ্ছে নাট্যগুরুর আত্মিক সংগ্রাম, সাধনা ও অভিজ্ঞতার জীবন। পরিবর্তমান আদর্শ ও বিশ্বাসের জগতে তিলে তিলে আঘাত সংঘাতের মধ্যে এই প্রতিভাটি বিকশিত হয়েছে। প্রতিভা পড়ে পাওয়া জিনিষ নয়; জগৎ জীবন ও আত্মপ্রচেষ্টার সম্মিলিত সৃষ্টি।

স্ট্যানিস্লাভস্কি যখন নাট্যজগতে প্রবেশ করেন তখন মস্কোয় Imperial Art Theatre-এর একচ্ছত্র আধিপত্য। ইম্পিরিয়াল থিয়েটার তাদের প্রাচীন রক্ষণশীল ভাবধারা নিয়ে যাবতীয় নাট্যপ্রচেষ্টাকে আগলে রেখেছিলেন। তখন নাট্যশালাগুলি মুষ্টিমেয় ধনিকশ্রেণীর খেয়াল মেটাত এইমাত্র। অভিনেতাদের কোনো সামাজিক মর্যাদা ছিল না। শুধু দু-একজন খ্যাতনামা অভিনেতাদের যা একটু সম্মান দেওয়া হতো। অভিনয়ের ভঙ্গি ছিল সেকেলে। অস্বাভাবিক স্বর চড়িয়ে মেকি আবেগ নিয়ে মঞ্চে অভিনয় চলত। অভিনেতারা মিনে করা মুখ আর অদ্ভুত সব পোশাকে সম্পূর্ণ অবাস্তব আবহাওয়া সৃষ্টি

করতেন। মঞ্চসজ্জা ছিল একেবারে রীতিবদ্ধ; সেখানে নতুনত্ব এনে ইম্পিরিয়াল আর্ট থিয়েটারের নীতির উপর টেক্কা দেওয়ার কারুর কোনো অধিকার ছিল না। নাটক নির্বাচনে ঐ বড়লোকের খেয়াল পরিতৃপ্তিকেই মাপকাঠি হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছিল। সামাজিক ভাবধারা ও চিন্তাদর্শের দিক থেকে সম্পূর্ণ অন্তঃসারশূন্য হালকা নাটকগুলিই ছিল ইম্পিরিয়াল থিয়েটারের একমাত্র মূলধন। নাট্যশালায় উচ্চ কোটির দর্শকেরা যখন খুশি আসতেন যেতেন যেন নাট্যশালা নিছক ফুর্তি করার জায়গা। অথচ নাটক ও নাট্যশালা সম্পর্কে স্ট্যানিস্লাভাস্কির ধারণা ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। তিনি নাট্যশালাকে মনে করতেন school of life যেখানে প্রগতিশীল ভাবধারা ও পরিচ্ছন্ন রুচিবোধ উপস্থিত থাকবে এবং যা মানুষের আত্মাকে দৈনন্দিন জীবনের ধূলিমলিনতা থেকে মুক্ত করে উর্ধ্বে তুলবে। ইম্পিরিয়াল আর্ট থিয়েটারের কাঠামোয় সে সুযোগ মোটেই উপস্থিত ছিল না। ইম্পিরিয়াল থিয়েটারের ভেতরে থেকে তাকে যে স্ট্যানিস্লাভস্কি ক্রমে ক্রমে সংস্কার করবেন তাও সম্ভবপর নয়। কারণ রক্ষণশীল মহল তাঁর ভাবধারাকে প্রশ্রয় দিতে মোটেই রাজী নন। একমাত্র উপায় নিজের থিয়েটার স্থাপন করে সেখানে নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো।

১৮৯৭ সালের ২২শে জুন স্ট্যানিস্লাভস্কির জীবনে একটা বিশেষ স্মরণীয় দিন। এই দিনে মস্কোর The Slavic Bazaar নামক রেস্তোরাঁয় তাঁর সঙ্গে নেমিরোভিচ-দানচেনকোর প্রথম সাক্ষাৎকার হয়। এই মণিকাঞ্চন যোগ স্ট্যানিস্লাভস্কির জীবনকে নব সার্থকতায় মণ্ডিত করে। দানচেনকো ছিলেন নাট্যকার এবং মস্কো ফিলহারমনিকের পরিচালক যেখানে তাঁর কাজ ছিল নতুন ,অভিনেতা তৈরি করা। আশ্চর্য এই, তাঁর নিজের অভিনয় দক্ষতা থাকা সত্ত্বেও তিনি সরাসরি মঞ্চে কখনও নামেন নি। রিহার্সালে নির্দেশক হিসাবে তাঁর কুশলতা ছিল অপূর্ব। উনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদে রুশীয় মঞ্চের অবস্থা সম্পর্কে দানচেনকো স্ট্যানিস্লাভস্কির মতো ঠিক একই পথে ভাবিত ছিলেন। তিনিও একথা বিশ্বাস করতেন যে রুশীয় মঞ্চ তার বিরাট ঐতিহ্য থেকে বিচ্যুত হয়ে কতকগুলি প্রাণহীন 'টেকনিক্যাল ক্লিশে'র মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে। দানচেনকোর পক্ষে স্ট্যানিস্লাভস্কিকে খুঁজে নেওয়া মোটেই অসুবিধাজনক হয় নি। স্ট্যানিস্লাভস্কি অভিনেতা, মঞ্চপরিচালক এবং একটি শৌখিন নাট্য সম্প্রদায়ের পরিচালকরূপে ইতিমধ্যে জনসমক্ষে বিশেষ পরিচিতি

লাভ করেছিলেন। The Slavic Bazaar রেস্তোরাঁর সাক্ষাৎকার বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করল ১৮৯৮ সালের ২৭শে অক্টোবর যখন মস্কো আর্ট থিয়েটারের পর্দা প্রথম উত্তোলিত হলো। আর্ট থিয়েটার প্রতিষ্ঠার সময় দানচেনকো ও স্ট্যানিস্লাভস্কি পরস্পরের দায়িত্ব সুনির্দিষ্ট করে নিয়েছিলেন। অভিনয়, পরিচালনা ও প্রযোজনার সব দায়িত্ব স্ট্যানিস্লাভস্কির। সাহিত্যগত প্রশ্ন ও সংগঠনের সমস্ত ভার দানচেনকোর উপর ন্যস্ত হলো। নাট্যজীবনে এই দুজন বিরাট প্রতিভা তাঁদের নির্দিষ্ট কার্যবিভাগ থেকে কখনও বিচ্যুত হন নি। দুজনের মধ্যে বোঝাপড়া ছিল এতই সুগভীর।

এই মস্কো আর্ট থিয়েটারকে কেন্দ্র করেই স্ট্যানিস্লাভস্কি নতুন অভিনেতার দল সৃষ্টি করেছিলেন, নাট্যপ্রয়োগ বিদ্যার বৈপ্লবিক উন্নতি সাধন করেছিলেন এবং নবদৃষ্টিসম্পন্ন বিরাট দর্শকমণ্ডলী গড়ে তুলেছিলেন। এ কাজে রাষ্ট্রশক্তি ছিল তাঁর বিপক্ষে। নগরের শাসক, সেন্সর ব্যবস্থা, চার্চের কর্তাব্যক্তি, ধনী ব্যবসায়ী সবাই চেষ্টা করেছেন পরিবর্তনের ন্যায়সঙ্গত গতিকে রোধ করতে। আর্ট থিয়েটারের অভিনয় বে-আইনী ঘোষণা করা হয়েছে, নাটকের গুরুত্বপূর্ণ সংলাপ সেন্সর কেটে দিয়েছে, থিয়েটার বয়কট এমনকি অভিনেতাদের শারীরিক ক্ষতির ভয় দেখানো হয়েছে। স্ট্যানিস্লাভস্কি কিন্তু কিছুতে বিচলিত না হয়ে অবিরাম নিষ্ঠায় তাঁর কাজ করে গেছেন। আর্ট থিয়েটারের দরজা খোলার পর ক্রমান্বয়ে মহৎ কয়েকটি নাটক মঞ্চস্থ করার ব্যবস্থা হয়। এর মধ্যে ছিল সেক্সপিয়ার, শেকভ, ইবসেন, গোর্কী, টলস্টয় প্রভৃতির নাটক। মহৎ নাটক দিয়েই নাট্যপ্রয়োগ বিদ্যায় মহৎ নীতি নির্ধারণের পথে তিনি অগ্রসর হয়েছিলেন। এক একটি নাটক মঞ্চস্থ করার ব্যাপারে তিনি কি বিচিত্র প্রয়াস না করেছিলেন! ইবসেনের যে নাটকটি তিনি নির্বাচন করেছিলেন সেটি হলো An Enemy of the People যার ডাঃ স্টকম্যান চরিত্রে তিনি নিজে নেমেছিলেন। এটি একটি socio-political নাটক। সামাজিক অন্যায়ের প্রতিবাদে প্রচুর ত্যাগ করে ডাঃ স্টকম্যানের একা বিদ্রোহ ঘোষণা এর মূল উপজীব্য। স্ট্যানিস্লাভস্কি তাঁর আত্মজীবনীতে বলেছেন: In my repertoire Dr. Stockman is one of those few happy roles that captivate by their inner strength and charm। ডাঃ স্টকম্যান প্রথমে মানুষের উপর অগাধ বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন, তাদের আপ্রাণ ভালোবেসেছিলেন। কিন্তু সেই মানুষগুলিই তাঁকে আস্তে আস্তে পরিত্যাগ করে চলে গেল, তাদের

দুষ্ট মনের পরিচয় তাঁকে ব্যথিত করল। তিনি বুঝতে পারলেন যে ক্রমশ তিনি একা হয়ে পড়ছেন। নাটকের শেষে তাঁকে বলতে শোনা গেল "He who stands alone is the strongest"। তৎকালীন রাশিয়ার রাজনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ডাঃ স্টকম্যানের সত্যের পক্ষে লড়াইয়ের এক বিশেষ গুরুত্ব ছিল। রাশিয়ার অধিবাসীরা জারশাসনের অত্যাচারে অত্যাচারিত। এই অবস্থায় তারা ইবসেনের এই চরিত্রটিকে তাদের 'হিরো' হিসাবে গ্রহণ করেছিল। স্ট্যানিস্লাভস্কি এই চরিত্রটির রূপায়ণে সম্পূর্ণ নিজের ভঙ্গিতে অগ্রসর হয়েছিলেন। তিনি আগে থাকতে ভেবে নেন নি যে তিনি একটি socio-political চরিত্র অভিনয় করতে যাচ্ছেন। কি ভাবে তিনি অগ্রসর হয়েছিলেন তা তাঁর নিজের ভাষাতেই শোনা যাক: "For the spctators the 'Enemy of the People' was a social-political play, for me it was one that belonged to the line intuition and feelings. Through them I grasped the spirit and passion of the role and the characteristic features of the life depicted by the play ; the 'trend' of the play revealed itself to me by its own power. As a result, I found myself on the social-political line—from intuition via reality and symbol to politics." ডাঃ স্টকম্যান চরিত্রের inner image ও outer image দুটো দিক আছে। প্রথমটিকে ঠিকমতো ধরতে না পারলে দ্বিতীয়টিতে আসা সম্ভব নয়। স্ট্যানিস্লাভস্কি চেয়েছিলেন নিজেকে মন ও আত্মার দিক থেকে ডাঃ স্টকম্যান-এর সংগে একীভূত করে ফেলতে। এর জন্যই তিনি নাটকের সামাজিক-রাজনৈতিক আবেদনটিকে জীবন্ত করে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন। অভিনয়ে অভিনেতার সূক্ষ্মতম অঙ্গ সঞ্চালনে পর্যন্ত তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকত। বক্তৃতামঞ্চে ডাঃ স্টকম্যানের দর্শকের প্রতি অঙ্গুলি প্রক্ষেপনের ভঙ্গিটি তিনি বার্লিনে এক বিশিষ্ট বন্ধুর আঙুল নাড়ার পদ্ধতি দেখে রপ্ত করেছিলেন। এই চরিত্রের রূপায়ণে তিনি তাঁর পা দাবানোর ভঙ্গির সঙ্গে সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছিলেন বিখ্যাত এক রুশীয় সংগীতকারের পদসঞ্চালনের।

এরপর আমরা আসছি গোর্কীর The Lower Depths নাটক মঞ্চস্থ করার ব্যাপারে। ক্রিমিয়াতে সমুদ্রের ধারে বসে থাকতে থাকতে গোর্কী মুখে মুখে স্ট্যানিস্লাভস্কি-দানচেনকোকে নাটকের কাহিনী বর্ণনা করেছিলেন।

প্রথমে নাটকটির নাম ছিল The Lower Depths of Life। পরে দানচেনকোর পরামর্শ অনুসারে শুধু The Lcwer Depths রাখা হয়। এই নাটকে স্ট্যানিস্লাভস্কি Satin-এর চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। Satin-এর চরিত্রটি বেদের (Tramp) জীবনের উপর ভিত্তি করে রচিত। বেদের ধর্ম হচ্ছে সন্ত্রাস, খুন, জখম, চুরি। এদের জীবনকে ঘিরে একটা ভয়াল সৌন্দর্য এবং রোমান্টিসিজমের আবহাওয়া সৃষ্টি হয়েছিল। নাটকটি মঞ্চস্থ করতে গিয়ে স্ট্যানিস্লাভস্কি ভাবলেন এই আবহাওয়ার চাক্ষুষ পরিচয় দরকার। তাই তিনি তাঁর দলবল নিয়ে মস্কোর khitrov market অঞ্চলে এই শ্রেণীর লোকেদের একটি গুপ্ত আড্ডা পরিদর্শনে গেলেন। সেখানকার লোকেদের সঙ্গে তিনি অন্তরঙ্গভাবে মিশলেন। নিজেকে তাঁর অনুপ্রাণিত মনে হলো। নাটকটির মূল তাৎপর্য তিনি ধরতে পারলেন। সেই মূল তাৎপর্য হলো freedom at any cost অর্থাৎ সেই স্বাধীনতা যার জন্য নিজের অজান্তে মানুষ জীবনের সর্বনিম্ন স্তরে নেমে যায়। বাস্তব-অভিজ্ঞতার জন্য দৃশ্যপট আঁকা ও মঞ্চসজ্জার কাজ সহজ হয়ে গেল। কিন্তু স্ট্যানিস্লাভস্কি বিপদে পড়লেন Satin চরিত্রটির রূপায়ণে। Satin-এর বক্তৃতা ও স্বগতোক্তির মধ্য দিয়ে নাটকের সামাজিক আবেদনটি ফুটিয়ে তুলতে হবে। অথচ এর উপরে যদি বেদের জীবনের রোম্যান্টিসিজম আরোপ করা যায় তবে জিনিসটা একেবারে নিছক নাটুকেপনা হয়ে যাবে। নাটকের ভাব ও রোম্যান্টিসিজমকে নিয়ে মাথা ঘামাতে গিয়ে Satin চরিত্র ঠিক রূপ দেওয়া সম্ভব হলো না। স্ট্যানিস্লাভস্কি বুঝতে পারলেন চরিত্রের অন্তর্রূপকে আগে ধরা দরকার বাকি যা কিছু পরে এসে যাবে। গোড়াতেই নাটকের tendency নিয়ে মাতামাতি করতে গেলে নাটুকেপনা ছাড়া আর কিছু হবে না। স্ট্যানিস্লাভস্কি এইভাবে নিজেকে শুধরে নিলেন। তাহলে দুটি নাটকের দৃষ্টান্ত থেকে আমরা বুঝতে পারছি তিনি কিভাবে তাঁর পরীক্ষা চালাতেন।

১৯০৫ সালে যখন ডিসেম্বর বিপ্লব পরাজিত হয় তখন চারিদিকের হতাশার মধ্যে স্ট্যানিস্লাভস্কি পর পর কতকগুলি 'সিম্বলিষ্ট' নাটক অভিনয়ের ব্যবস্থা করেছিলেন। নাটকগুলি ছিল মেতারলিঙ্ক, আন্দ্রিভ, হামসুন, মেরেজকোভাস্কি প্রভৃতির। ১৯১০ থেকে ১৯১৭ সালের মধ্যে তিনি রুশীয় লেখকবৃন্দ পুশকিন, তুর্গেনীভ, শেড্রিন, দস্তয়েভস্কির বিভিন্ন নাটক মঞ্চস্থ করেন। এমন কি ১৯১৭-১৮ সালে মস্কো আর্ট থিয়েটারে রবীন্দ্রনাথের তিনখানি নাটক চিত্রা, ডাকঘর ও

রাজা-র (?) রিহার্সাল আরম্ভ হয়। গৃহযুদ্ধের দরুণ শেষ পর্যন্ত এ নাটকগুলি আর অভিনীত হয় নি। যাই হোক একটা কথা বোঝা যায় যে স্ট্যানিস্লাভস্কির repertoire ছিল অত্যন্ত সমৃদ্ধ ও বৈচিত্র্যময়। প্রত্যেকটিই মহান নাটক এবং সেজন্যই সেগুলিকে মঞ্চে রূপায়িত করার দায়িত্ব বিরাট। স্ট্যানিস্লাভস্কির কৃতিত্ব হলো এইখানে যে তিনি প্রতি নাটকের বেলায় নতুনভাবে চিন্তা করেছেন যাতে তার dramaturgy সম্পর্কে গবেষণার কাজটা তিনি এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন।

স্ট্যানিস্লাভস্কি অভিনেতার দক্ষতা ও মর্যাদার প্রশ্ন একই সঙ্গে ভেবেছিলেন। ইম্পিরিয়াল আর্ট থিয়েটারের আমলে অভিনেতাদের অনেকটা 'ক্লাউনে'র মতো মনে করা হতো। নাট্যশালা হচ্ছে নিছক আমোদের জায়গা। যাঁরা ধনী পৃষ্ঠপোষক তাঁরাই সর্বেসর্বা। নাটক আরম্ভ হয়ে যাবার পর বিশ্রী শব্দ করে যখন খুশি তাঁরা আসবেন যাবেন। ফলে যাঁরা সত্যি সত্যি নাটকের শিল্পরূপ উপভোগ করতে আসতেন তাঁরা বঞ্চিত হতেন। আর্ট থিয়েটার প্রতিষ্ঠার পর দশ বছরের মধ্যে একশ্রেণীর দর্শকের এই আচরণ তিনি একেবারে পালটে দিলেন। আর্ট থিয়েটারে পর্দা ওঠার পর নাট্যগৃহে প্রবেশ নিষিদ্ধ হয়ে গেল। শুধু ভালো নাটক নয়, নিয়মশৃঙ্খলার দ্বারাও উন্নত দৃষ্টিভঙ্গির দর্শকসমাজ তিনি গড়ে তুলেছিলেন। এরপর অভিনয়ের দিনে সময়ে আসার প্রশ্ন। একদিন স্ট্যানিস্লাভস্কি মস্কোর এক থিয়েটারের গ্রীনরুমে উঁকি দিয়ে দেখেন মহা গণ্ডগোল। প্রায় আটটা বাজতে চলেছে অভিনয় এখনি শুরু হবে অথচ 'হিরো'র ভূমিকায় যিনি অভিনয় করবেন তিনি অনুপস্থিত। মঞ্চ পরিচালক বিমূঢ়ের মতো এদিক ওদিক ছোটাছুটি করছেন। অন্যান্য অভিনেতারা ইতস্তত করছেন; ভাবছেন নতুন কোনো নাটকের জন্য মেক-আপ নেবেন কিনা। এমন সময় ঠিক ৭-৫৫ মিনিটে 'হিরো' এসে উপস্থিত। সবাই খুশি কারণ অভিনয় হবে। আমাদের 'হিরো' দু-এক মিনিটে মেক-আপ সেরে নিয়ে হুড়মুড় করে স্টেজে নেমে পড়লেন। এই ধরনের অভিনেতা সম্পর্কে স্ট্যানিস্লাভস্কি বলছেন "He comes to the theatre with a costume in his suitcase, but without any spiritual baggage. What can he do in his dressing-room from 5 to 8 P.M.? Smoke? Tell jokes? Why, its better to do that in a restaurant." স্ট্যানিস্লাভস্কি আরো বলছেন এই অভিনেতারা হয়ত শরীরকে তৈরি করেছেন,

মুখে ঠিকমতো রঙ মেখেছেন কিন্তু এই অবস্থায় তাঁদের যদি প্রশ্ন করা হয় "You've got your costumes on and you are made up, but have you washed, costumed and made up your soul?" তাহলে উত্তর বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই হবে নঙর্থক। স্টেজে নামতে হলে অভিনেতাকে শুধু বাহির নয় ভিতর থেকেও প্রস্তুত থাকতে হবে। Talent-এর দোহাই দিয়ে এক মিনিটে নিজেকে ভিতর থেকে তৈরি করে নেওয়া যায় না। অভিনয়ে actor's mood এবং creative mood এ-দুটো সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস। Creative mood-টাই হচ্ছে আসল; এছাড়া শিল্পসত্যকে ধরা একেবারে সম্ভব নয়। স্ট্যানিস্লাভস্কি তাঁর থিয়েটারে অভিনেতাদের খেয়াল মতো আসা-যাওয়া নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলেন।

১৯২০ থেকে ১৯৩০ সালের মধ্যে স্ট্যানিস্লাভস্কি নাট্যতত্ত্ব সম্পর্কে তাঁর মূল রচনাগুলি প্রকাশ করেছিলেন। এ ব্যাপারে দুটি গ্রন্থ—An Actor Prepores ও Building a Character বিশ্বের নাট্যবিদদের কাছে নাট্য-শাস্ত্রের গীতারূপে পরিচিত। এই গ্রন্থগুলিতে স্ট্যানিস্লাভস্কি তাঁর বিখ্যাত 'সিস্টেম' ব্যাখ্যা করেছেন। অভিনেতাকে শারীরিক ও মানসিক দুই দিক থেকে একটি বিশেষ দিন ও ক্ষণে সমস্ত শক্তি প্রয়োগের উপযোগী করে তোলার জন্যই এই সিস্টেমের প্রবর্তন করেন। শিল্পী, সঙ্গীতকার, কবির যে অবস্থা অভিনেতার তা ঠিক নয়। শিল্পী-সঙ্গীতকারেরা অনুপ্রেরণার জন্য অপেক্ষা করতে পারেন। কিন্তু অভিনেতার তা চলবে না। পূর্ব থেকে ঘোষিত দিন ও ক্ষণে তাঁকে দর্শকের সামনে উপস্থিত হতেই হবে। তাই স্ট্যানিস্লাভস্কি বলেছেন: An actor cannot wait for inspiration to visit him. He must be the master able to wield it." তাঁর সিস্টেম অনুপ্রেরণাকে সময়ের কাঁটায় বিদ্ধ করায় সহায়তা করে। স্ট্যানিস্লাভস্কি তাঁর সিস্টেমের বর্ণনা এইভাবে দিয়েছেন: "My 'system' falls into two main parts: 1) the actor's inner and outer work on himself; 2) inner and outer work on the role. Inner work on oneself consists in developing psychic technique which enables the actor to work up a creative mood in which he finds inspiration. Outer work on oneself consists in preparing one's body apparatus to incarnate the role and fully bringing out its inner life. Work on

a role consists in studying the spiritual content of the drama, the core around which its is built and which determines its meaning as well as the meaning of each of its roles." তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি স্ট্যানিস্লাভস্কি তরুণ অভিনেতাদের দুইভাবে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। একটি হচ্ছে নিজেকে তৈরি করা অর্থাৎ নিজের দেহ মনকে অভিনয়ের উপযোগী করে তোলা। এর জন্য অভিনেতা অনুপ্রেরণাকে বশে আনার বিদ্যা আয়ত্ত করবেন এবং স্বর, ছন্দজ্ঞান ও বাচনভঙ্গী রপ্ত করবেন। অপরটি হলো যে ভূমিকা অভিনেতা রূপায়িত করছেন সে বিষয়ে নিজেকে তৈরি করা। আমরা আগেই বলেছি স্ট্যানিস্লাভস্কি এ ব্যাপারে intuition and feelings-এর পথকে গ্রহণ করেছিলেন। আলোচ্য 'সিস্টেম' সম্পর্কে সবচেয়ে বড় কথা হলো এটা কোনো মনগড়া সৃষ্টি নয়। তাঁর সমগ্র জীবনে নিজের এবং অগণিত ছাত্রদের উপর পরীক্ষা চালিয়ে নাট্যপ্রয়োগ সম্পর্কে যে অভিজ্ঞতা স্ট্যানিস্লাভস্কি অর্জন করেছিলেন তার ভিত্তিতেই 'সিস্টেম'টি রচিত। সেকারণে নাট্যগুরু দাবী করেছেন যে তাঁর এই 'সিস্টেম' নাট্যজগতের প্রত্যেকেরই অনুধাবন ও চর্চা করা উচিত। শুধু অভিনেতারা নন, নাট্যপ্রযোজক ও নাট্যকার সকলেই এর থেকে প্রচুর শিক্ষালাভ করতে পারেন। স্টানিস্লাভস্কি তাঁর আত্মজীবনীতে বলেছেন: "The method of acting that I have discovered allows the actor to create images, reveal the life of human spirit and naturally incarnate it in a beautiful artistic form on the stage." অভিনয়ের এই সমস্ত গুণাবলী প্রত্যেক দেশের নবীন-প্রবীন অভিনেতাদের কামনার বস্তু। সে হিসাবে 'স্ট্যানিস্লাভস্কি সিস্টেম' বিশ্বসংস্কৃতির পরম সম্পদ।

ভারতীয় সাহিত্য সম্পর্কে স্ট্যানিস্লাভস্কির যে উৎসাহ ছিল তা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। ১৯১৭ সালে তিনি রবীন্দ্রনাথের চিত্রা, ডাকঘর ও রাজা নাটক তিনটি মঞ্চস্থ করার কথা চিন্তা করেছিলেন। তাই এবার আমরা আলোচনা করব বাংলার নাট্যজগৎ স্ট্যানিস্লাভস্কির শিক্ষা থেকে কি করে লাভবান হতে পারে। বাংলা থিয়েটার এক সময় নানা নোংরামিতে পূর্ণ ছিল। আগেকার দিনে বাংলা নাটকে মঞ্চ প্রযোজক ও পরিচালকের কোনো প্রতিপত্তি ছিল না, কয়েকজন প্রখ্যাতনামা অভিনেতার খেয়াল মতো অভিনয় পরিচালিত হতো। প্রধান অভিনেতারা বিশেষ 'ম্যানারিজম্' নিয়ে

অভিনয় করতেন। নাট্যশালাগুলি ছিল নিছক আমোদের স্থান। প্রতি নাটকেই প্রায় হালকা গান ও নাচ থাকত। দর্শকরা অনুরোধ জানালে মঞ্চে নাচ বেশী সময় দেখানো হতো। হালে অবশ্য সিনেমার চাপে বাংলা নাট্যশালা অনেক পরিবর্তিত হয়েছে। অভিনয়-পদ্ধতি অনেক স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। মঞ্চসজ্জাও অলৌক্তিক আড়ম্বর বর্জন করে সহজ হয়েছে। বৈজ্ঞানিক আলোক-সম্পাত দ্বারা নাটকের আবেদন আজ অনেক বাস্তবানুগ। তবু কলকাতার ব্যবসায়িক ভিত্তিতে পরিচালিত থিয়েটার, যেখানে একই নাটক একাদিক্রমে শত শত রজনী অভিনীত হয়, সেখানে নাটক সম্পর্কে নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা একেবারেই সম্ভব নয়। তাই বাংলানাটকের বর্তমান নির্ভরস্থল হল শৌখীননাট্য-প্রচেষ্টা যা এখন কলকাতায় ও মফঃস্বল সহরগুলিতে অজস্র ফুলেপল্লবে পল্লবিত হয়ে উঠেছে। নাটক নির্বাচন ও তা মঞ্চস্থ করার ক্ষেত্রে সর্বত্রই একটা বলিষ্ঠ আদর্শবাদ আমাদের চোখে পড়ছে। বাংলার শৌখীন নাট্যপ্রতিষ্ঠানগুলি স্ট্যানিস্লাভস্কি 'সিস্টেম' ভালোভাবে চর্চা করলে তাঁদের আদর্শবাদকে আরো ফলপ্রসূ করে তুলতে পারবেন। প্রসঙ্গত এখানে উল্লেখযোগ্য যে কলকাতায় সরকারী নাট্য আকাদেমীতে স্ট্যানিস্লাভস্কি সিস্টেম চর্চার এখনও কোনো উপযুক্ত ব্যবস্থা হয় নি। যতদূর জানি An Actor Prepares এবং Building a Charactor এ দুটি গ্রন্থ আকাদেমীর পাঠ্যতালিকাভুক্ত করা হয় নি। অথচ রুশীয় নাট্যবিদের থিয়োরীর সর্বজনীনতার কথা আমরা উল্লেখ করেছি। যাই হোক বাংলার নবনাট্য আন্দোলনে দু'একটা আশঙ্কার ব্যাপার আমরা লক্ষ্য করছি। এক সময়ে বাংলা নাট্যমঞ্চে অভিনেতার প্রাধান্য ছিল। এখন তার উল্টোটা করার চেষ্টা হচ্ছে অর্থাৎ পরিচালকের একচ্ছত্র আধিপত্য স্থাপনের চেষ্টা চলছে। এ বিষয়ে কিন্তু আমরা স্ট্যানিস্লাভস্কির শিক্ষার বিপক্ষে যাচ্ছি। কারণ আধিপত্য এলেই খানিকটা dogmatism-এর ভাব এসে যাবে। Dogmatism স্ট্যানিস্লাভস্কি একেবারে পছন্দ করতেন না। অভিনেতাদের creative mood অধিগত করার ব্যাপারে পরিচালকের অতি-আধিপত্য কখন কখনও বিঘ্ন সৃষ্টি করতে পারে। আজকাল বাংলা-মঞ্চে আলোর মারপ্যাচের এক জোর প্রচেষ্টা চলেছে। বলা হচ্ছে নাটককে বাস্তবানুগ করে তুলতে হলে এবং ফিল্মের আবেদনের সঙ্গে পাল্লা দিতে হলে এ জিনিস অপরিহার্য। একটু ভেবে দেখলে দেখা যায় নাটক দাঁড়ায় অভিনেতাদের অভিনয় গুণে। আলো সাহায্যকারী একটি শক্তি মাত্র। হালে কিন্তু

আলোকসম্পাতের ব্যাপারটা অভিনয়কেও ছাড়িয়ে যেতে চাইছে। আলো দিয়ে সাময়িক অভিনবত্বে দর্শককে আমরা ভোলাতে পারি। কিন্তু তাতে তাঁদের অভিনয় উপভোগ থেকে অনেকটা বঞ্চিত করব। এ অধিকার বোধ হয় কারুরই নেই। স্ট্যানিস্লাভস্কি যাকে living their role not acting বলেছিলেন তা তো আলোর কারসাজির দ্বারা হয় না। মস্কো আর্ট থিয়েটারে অতি সাম্প্রতিক অভিনয়ে দেখা গেছে যে সেখানে আঙুলের ডগা পর্যন্ত অভিনয় করে। এই যেখানে অবস্থা সেখানে আলো নিয়ে অত্যধিক মাতামাতি করাটা কি উচিত? আমাদের একথা সর্বদাই মনে রাখতে হবে আনুষঙ্গিক সরঞ্জামের যত ব্যবস্থাই হোক না কেন অভিনয়কে সবার উপরে প্রাধান্য দিতে হবে। তা না হলে স্ট্যানিস্লাভস্কি 'সিস্টেম'কে আমরা কোনো কাজেই লাগাতে পারবো না।

সুঅভিনয়, প্রযোজনা, এবং দর্শক গড়ে তোলা—এই ত্রিবিধ কাজ স্ট্যানিস্লাভস্কি একই সঙ্গে সম্পন্ন করেছিলেন। আজকে এই ১৯৬৩ সালে যদি আমরা নাট্যশালার উন্নতি কামনা করি, মানুষকে শিক্ষা দিতে চাই ও তাকে দৈনন্দিনতার আবিলতা থেকে মুক্ত করতে চাই তবে আমাদের এই ত্রিবিধ সমস্যার কথা ভাবতে হবে। বর্তমান আলোচনার আমরা উপসংহার করতে চাই স্ট্যানিস্লাভস্কিরই কথা উদ্ধৃত করে: When I look back on the road I have .traversed, on my life in art, I want to compare myself to a gold seeker who first has to roam the wilderness to find a streak of gold, then wash tons and tons of sand and rock to get a few grains of the valuable metal. And like a gold seeker, it is not my labours, my quest and privations, my joys and disappointment that I can bequeath to my descendents, but the gold vein that I had found. এই gold veinই হচ্ছে তাঁর 'সিস্টেম'। স্ট্যানিস্লাভস্কির প্রতি নাট্যপ্রিয় বাঙালির সবচেয়ে বড় শ্রদ্ধার্ঘ্য দেওয়া হবে যদি আমরা কলকাতায় যত ছোট করেই হোক এই 'system' অনুশীলনের স্থায়ীকেন্দ্র স্থাপন করতে পারি। শতবার্ষিকীতে এই মহান নাট্যগুরুকে আমরা শ্রদ্ধানত চিত্তে স্মরণ করি।

নিহত সূর্যের জন্যে ॥ রাম বসু

আলো অন্ধকারে বোনা পীড়িত হৃদয়
মৃতের মুখের জ্যোতি অবারিত স্মৃতি
আর যা সম্ভব ছিল সব নীরবতা
পাহাড়ের নিচে হ্রদ, রক্তমাখা তীর
গির্জার সোপান কিংবা মূঢ়তা আমার।

এখানে দাঁড়াও পান্থ! হে দেবতা তুমি
নিহত সূর্যকে ধর তার নগ্ন ওষ্ঠের ওপর।

তৃষার্ত, প্রস্তুত হও। দুর্বলতা লুকিয়ে রেখো না
দাক্ষিণ্যকঠিন বজ্র। হাহাকারে সঙ্গতি, সুষমা
ধোঁয়ার সুন্দর ডিঙা ছ্যাখো যায় নক্ষত্রের দিকে
যে শূন্যে বেলের কুঁড়ি কুণ্ঠাবতী গন্ধের ভিতরে
সময় হয়েছে তার এইবার সম্পূর্ণ হওয়ার।

নিহত সূর্যকে তুমি হে দেবতা তোল
তার তপ্ত অন্ধকার ওষ্ঠের ওপর।

বিকার, মুকুট নেই; অনুতাপে শান্ত দৃশ্যাবলী
ডিঙা যায় ডিঙা যায় মহাশূন্য কাঁপে দীনতায়
শব্দ, কৃষ্ণ-সহোদরা, হও দীপ বর্জিত দেউলে
গর্বিত হওয়ার দিন শেষ হয়ে গেছে। নীরবতা
জীবনের হে অন্ধ দেবতা! শেষ মাধুর্যের প্রতি
এখনও বিশ্বাস আছে; তাই দেখব যা কিছু দেখার।

নিহত সূর্যকে তুমি অনিবার্য বিভা
তুলে দিয়ো নগ্ন তপ্ত গন্ধের ওপর।

ঘোর শব্দে, আলোড়নে ॥ চিত্ত ঘোষ

চোখের সম্মুখে ধ্রুব উচ্চতা পতিত :
পতনের ঘোর শব্দে, আলোড়নে
আমরা ভেঙে গিয়ে এক মথিত চরিত্র।
পশ্চাতে সম্মুখভূমি, পশ্চাদ্‌ভূমির
উজ্জ্বল গরিমা বাষ্প, ধুলো হতে চায়।
সময়ে ফাটল, দীর্ঘ ভয়াবহ চিড়।
উচ্চতম শিলাভাগ নিম্নতম অতল পাতাল।
বরফের সাদা বনে হননের শব্দ শুধু :
স্মৃতির পুরনো পথ, অবিস্মৃত পুরনো পথিক
সেদিনের সে-হৃদয় বিদ্ধ, অন্তদিনে
হত্যা, প্রতিহত্যা, শব।
আমাদের অস্থিতে মজ্জায় স্নায়ুদেহে
তীব্রতম ধাক্কা ও ঝাঁকুনি।
টান লাগে মূলে, যেন ছিঁড়ে যায়
যেন বুঁজে আসে
প্রবাহের মুখ।
পাথর গড়ানো দিন, পাথর চাপানো রাত্রি
পাথরের ধ্বনি প্রতিধ্বনি।
স্মৃতি স্বপ্ন কোমলতা কঠিন পাথররূপ নেয়।
ক্রোধ জলে যেন গ্রীষ্মে পাথরের বনে।

উঠে আসে, নেমে যায় গভীর নিম্নের দিকে স্থির উন্মোচনে
সজ্জিত ঘৃণার ক্লেদ-মুখ।
প্রভূত জঞ্জাল, জল পার হয়ে হয়ে
হৃদয় ধ্বনির নিচে ছায়া খুঁজে খুঁজে
শব্দের মন্ত্রের দিকে হেঁটে যেতে চেয়ে
শুদ্ধ চেতনার শীর্ষে
দুর্গম উচ্চতা ভেঙে সীমান্তের দিকে
প্রত্যয়ের স্বচ্ছতায়, কুয়াশায়
প্রত্যহের বিঘ্নে ও বাধায়
চিরদিন দ্বিধা, দ্বন্দ্ব, অধিকার পর্বতের প্রতিধ্বনি হয় ॥

স্বদেশে, বিদেশে ॥ তরুণ সান্যাল

১

আমি যদি কবিতা না লিখি তাহে কিবা আসে যায় :
কবিতা লেখে না ফুল পাপড়ি ও স্তবকে···পঙ্‌ক্তি মিলে,
সমুদ্র তরঙ্গভঙ্গে বালুরেখায় কই ছন্দোস্পন্দে নীলে
ব্যঞ্জনা লেখে না শব্দে, শুধু ধ্বনি নিরবধি শব্দ হতে চায়,
শব্দ কিংবা শব্দবন্ধে কে-বা লেখে স্পন্দিত নিখিলে···
উহারা কবিতা স্বতঃ, উহাদের বিরাম বিদায়
উন্মোচনে লক্ষ, ধূপছায়া কম্প, রীতি তিলে তিলে
ভঙ্গুরে রেখেছে শিল্প বস্তুবোধে নিত্য কবিতায়।

আমাকে কবিতা কারা লেখাবারে চাবুক চালায়,
বিষয় : সত্যেরে ঘৃণা, রীতি : আত্মহননে, জ্বালায় :
আমাকে লেখাতে চায় মৃত্যুর বনামে ভীতি, ক্রোধ,
ঘৃণা উন্মোচনে ছেড়ে চোখের মণিরও প্রিয় প্রীতি···
···কোটি শব্দ সমবায়ে এত ঘৃণা বিতৃষ্ণা বিরোধ···
হায়, ঐ শব্দপুঞ্জ আছিল যে কবিতার পরম নিভৃতি ॥

২

ঘুমাও নির্জনে প্রেত, জাগিয়ো না, কেননা অদ্যাপি
ঘৃণা সঙ্কুচিত হয়ে কামানের নল নয়, ফুলে সঙ্কুচন···
কেননা তমসা পোড়া গন্ধকে স্ফুরণ নয় : স্বতঃ নির্বাচন
হোক পুষ্পাধারে, যথা কোমল শিশিরে স্বচ্ছ বাপী।
চতুর্দিকে ঘৃণা হায়, কেমন আবিল হতে চায়
যেন ঘোর ধূম্রজালে প্রচ্ছদ পরাতে চায় চতুর তস্কর
গৃহস্থ যেনবা ঘুমে, কিংবা হয় যদিবা জাগর
দিগ্‌ভ্রান্ত, বন্ধু যেথা বর্শা বজ্র সে লক্ষ্যে নাচায়!

নিদ্রা যাও প্রেত, যাও কবরে, শ্মশানভূমে শুয়ে ;
পুনর্বার স্বচ্ছদৃষ্টে দেখি ভ্রাতা বান্ধবের মুখ,
দেখি প্রিয়জন চায় ফোটাবারে স্পর্ধিত মুকুল
বিশশালা কল্পনায় শোষণ ঘৃণার কালি ধুয়ে ;
এসো সাম্য, সম্ভাবনা, অনাবিল আবিশ্ব···উন্মুখ—
জাগিয়ো না প্রেত, আছি প্রতীক্ষায় ফোটাবারে ফুল ॥

একটি সোনালী শামুক

সৈয়দ মুস্তফা সিরাজ

এখন শীতের ভোরে মাঠগুলো ন্যাংটা বাচ্চার মতো গ্রামের কোলে গুটিসুটি শুয়ে রয়েছে। তাতে সারারাত ধরে খসতে থাকা কুয়াশার নিচে মাঠগুলোর হলুদ শরীর সত্যি নীল ও নিথর দেখাচ্ছিল। এবং শিশিরে পা চুবিয়ে চুবিয়ে ওরা যখন বেহুলার পাড়ে এসে দাঁড়াল ওদের পায়ে প্রচুর ঘাসের ফুল জড়িয়ে গেছে। ফলে দুটিতে পরস্পর পা দেখতে দেখতে মুচকি হাসল। পা সাফ করার জন্যে ভেজা ব্যানার বনে বারকয় ঘষল। যদিও পুরুষটিকে এখুনি বেহুলার ভাপওঠা হিমজলে ডুবতে হবে।

মেয়েটি এ সময় বেহুলার স্রোতবর্তী জলের মুখ দেখছে পলকহারা চোখে। কিছু কথা বলে দৃশ্যটা পুরোপুরি বর্ণনার ইচ্ছে। অথচ বলতে ঠোঁট দু-খানি একটু কেঁপেই থেমে যাচ্ছে। যেন বলার কিছুই নেই, 'দেখছো তো চেহারাখান্!'

রতু বরাবরই বৌর চোখ দেখে সব টের পায়। রতু হাসবার চেষ্টা করছে —জলে কিছু অমায়িকতা দেখল সম্ভবত। রতুরও ঠোঁট দুটি কেঁপে দাঁতে দাঁতে ঘষা খেয়ে হাসিটা একসময় ভেজা নেকড়া হয়ে নেতিয়ে পড়ল, ঝুলতে থাকল বিশ্রীভাবে। রতুর বলতে ইচ্ছে: 'অনেক শীত আমি দেখেছি রে ওলাং। এবং শীতের জল।' কিংবা: 'জলের ভেতর সবসময়ই স্বপ্নের আরাম।' কিন্তু কেবল বলতে পারল, 'সেবার ডুবে ডুবে এক ঝাঁক ঝিনুক তুলেছিলাম।' ওলাং এখন ঝিনুক খেতে খুবই ভালবাসে বলে এটুকু সশব্দে প্রকাশ করা সঙ্গত বোধ হয়েছে। তাছাড়া শীতের পর মাঠের নিঃসঙ্গ শিমুলের মন্দারের ডালে ডালে একদিন থরে থরে লাল ফুল ফুটবে, জানোয়ারের খুরে ওড়া ধুলোর রাশি গরম হতে হতে ফুলগুলোকে ম্লান করতে থাকবে, হয়তো খরার আমের ঠোঁটে ঠোঁটে বয়ে আনল সবে দক্ষিণের সমুদ্র থেকে ক্লান্ত হাওয়ারা, তখন ওলাং তলপেটে হাত রেখে ককিয়ে উঠবে, এবং ওলাং-এর নিশ্চিত বাচ্চা হতে চলেছে, ওলাং গোগ্রাসে ঝিনুকের মাংস পুড়িয়ে সুনলংকা মাখিয়ে

ভয়ানকভাবে মাথা নেড়ে চিবুবে। 'পোয়াতীর পক্ষে এমন সুপথ্যি আর নাই বাছা' ওলাং-এর মা তরঙ্গবালা বলে গেছে। ঝিনুকের চেহারার সঙ্গে এই বুড়ীর কেশভরা জটা, পুরু সিঁদুরের ছোপ কপালে, ভর উঠলে প্রচণ্ড দুলুনি— সবগুলো চমৎকার খাপ খেয়ে গেছে রতুর মনে। তাই গায়ের ছেঁড়াফাটা তুলোর বস্তরখান উদোম করতে করতে আর একবার কথা বলতে চাইল রতু, 'শাউড়ী বুলেছিল, না?'

'যেমন শাউড়ী তেমুনি জামাই!' ওলাং শরীর কাঁপিয়ে হাওয়ালাগা তিরতির স্রোত হচ্ছে। অর্থাৎ উল্লাসটা শীতের হামনদিস্তায় এমনি করে ছানা হল।

উদোম গায়ে দাঁড়িয়ে গামছাটা ঠেসে লেংটি বানাচ্ছে রতু। পাছার হাড়ওঠা তালদুটো দেখতে পাচ্ছে ওলাং। ফাটাফাটা খস্‌খসে কালো কালো ছোপ। চামড়ায় অগুনতি ছোট ছোট বুজকুড়ি ফুটছে যেন। রতু না হনুমানটি। ওলাং-এর বারবার হাসতে ইচ্ছে করে। হাসলে বরং শীতও কিছু কমে যাওয়া উচিত। 'পালোয়ানটো বেহুলাকে ডরায় না সত্যি। অবাক যাই বাপু।'

রতু ঘুরে ওর মুখ দেখল। ওলাং কুঁজো হয়ে হাঁটুতে হাত রেখেছে। বেহুলার জল আর রতুর শরীর এই নিয়ে বুঝি কিছু ভাবছে। রতু টানটান হয়ে হাত দুখানি দুপাশে ঝাঁকি দিল। তারপর পা দুখানি। 'সার্কেসের বাজী দেখাব ওলাং, চোখ বুজে থাকিস্।' তারপরই ঘুরে পুবমুখো তাকিয়ে ডিমের কুসুমের মতো থলথলে সূর্যটা দেখে নিয়ে পাড় থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

ওলাং সত্যি চোখ বুজেছে। বেহুলার ভারী জলে আচমকা কাঁপন। কাঁপন আর শব্দ। শব্দটাও যেন ভারী আর ঠাণ্ডা মনে হয়েছে। রতু ডুবে রয়েছে এখনো। ওলাং-এর হৃদপিণ্ডে সেই কাঁপন আর শব্দ—মোটা মোটা বুজকুড়ি ভাঙছে, গড়ে উঠছে। রতু কি আর উঠতে পারবে—ওলাং হাই তুলে সোজা হতে হতে দুবার ফোঁস ফোঁস করে নাক ঝাড়ল। বুজকুড়িগুলো জানিয়ে দিচ্ছে রতুর অন্তবর্তী যাতায়াতটা। ওলাং মাছের চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে।

আজ অবশ্যি এত সকালে ঝিনুক তোলার জন্যে নামেনি রতু। অন্তত একটিও সোনালী শামুক তুলবে জলের নিচে থেকে। এ-বছর মাঠে বান ওঠে নি বলে এই অতিকায় শামুকগুলো পৈ পৈ খুঁজে মিলবে না। অনেক

খুঁজেছে ওলাং। শামুকটা সেদ্ধ করে ভেতর থেকে মাংসগুলো বের করে নেবে। স্বাদ মন্দ না, রতু তো বলে 'অমিত্যের তুল্যি।' কিন্তু আসলে ওর খোলটাই দরকার। খোলের কিনারাটা বড্ড ধারালো হয়ে থাকে। ফলে মাঠে মাঠে ফসলওঠা জমি থেকে অগোছাল ধানের শীষ কুড়োতে ভারি কাজ দেয়। লম্বা খড়ের ডগা থেকে ওর সাহায্যে শীষগুলো কচ্ করে কেটে নেওয়া সোজা। ধানের পাহারাদার 'জাগাল'দের হিংসুটে কিপ্টে গেরস্থ আর চাষীদের চোখ এড়িয়ে শীষ কুড়নো সহজ হয়ে ওঠে। এখন শীতের প্রারম্ভে সবখানে মাঠচরা মেয়েরা আগেভাগে কেবল কয়েকটি সোনালী শামুক সংগ্রহে তৎপর। ওলাং পোয়াতী বলে ওর জলে ডুবতে মানা। এবং শুধু মানাটার জন্যেই নয়, ওলাং-এর কেমন ভয় করে। 'পেথম পোয়াতী—অধিক বয়েসে মা হচ্ছিস ওলাঙ্গিনী, এগুলো মেনে চলবি', মা তরঙ্গ ওকে একদফা ফিরিস্তি দিয়ে গেছে। জামাইকেও খবরদারী নিতে বলেছে বুড়ী। 'ওরে বাস্ রে, খোদ্ মা শেতলার কন্যে, ওনার বাক্যি অমান্যি করি কী সাহসে', রতু কপালে হাত ছুঁইয়ে হা হা হাসে। অথচ এও যেন আসল কারণ নয়। রতু এবং ওলাং দুজনেই ভেবেছে ওদের একটি মহৎ কোনো পরিণতি প্রতিমার মতো বানানো হচ্ছে, তাই মনটা যেমন, শরীরও তটস্থ রাখতে হয়। 'পালন-টালন করে চলিস ওলাং' রতু সব সময় বলে থাকে। এদিকে ওলাং-ও তলপেটে একটা জীবিতের অস্তিত্ব নিয়ে অনেক ভাবে। ভাবে আর ভয় করে। 'মাগো, জলে ডুব দিলে, বুঝি পুক্‌ড়োটার দমবন্ধ হয়ে যাবে!' এবং 'আমি যদি দুঃখু পাই, বাচ্চাটাও কি আর না পাবে এট্টু?'

'আহা রে, একই নদী দু ধারায় বইছে ওলাং!' শব্দগুলোও নদীর জলের মতো ছল ছল বাজে ঘুমে জ্যোৎস্নায় অন্ধকারে রোদে আর হাওয়ায়। ওলাং দুঃখকে এড়িয়ে হাসির ঘর গড়েছে। রতুও। এখন এই দুরন্ত দামাল শীতের রাতে পরস্পর শরীর শুঁকে সেই অনিবার্য পরিণতির ঘ্রাণগুলো একটু একটু নিতে চেয়ে হাসির ঘরের কাচগুলো পলকে পলকে উজ্জ্বল হতে দেখে। ফুটো চালের ফাঁকে একটি কি দুটি অবোধ তারা। পুরনো কানিচটা কাঁথার ওপর তাদের সম্ভাবিত তাপটুকুও টের পায়, অনুভূতি তখন এতখানি প্রখর। 'একটি পুকড়ো থাকলে আমার দুঃখু দূরে যেত ওলাং।' রতু ওর তলপেটে হাত বুলিয়ে বলেছিল। 'বাপে পোয়ে ভাগচাষ করতুম, একখান হাল একজোড়া বলদ গরু। বাছুর কিনলে পয়সা কম লাগে, বুঝলি?' ওলাং চোখ বুজে

বলেছিল, 'পুকড়োটা একদিন বড়ো হবে। বাছুর দুটো মাঠে মাঠে চরিয়ে তাজা করে দেবে। সত্যি বুলেছি কিনা?' 'ঠিকই বুললি ওলাং।' ওরা টের পেয়েছে, একটা সুদিন আসছে, তৈরি হয়ে থাক্‌া ভালো। কিছু ধান সঞ্চয় করা দরকার।

সূর্য আরো একটু উজ্জ্বল হলে শিশিরভেজা ধানগুলো জমিতে জমিতে ডাঁটো হবে। এবং রতু তখন মাঠে উঠে যাবে ধানকাটার মুনিস হয়ে। চাষারা এই মরশুমে যেন পাগলা হাতি হয়ে ওঠে। যত জেদী তত হিংসুটে। মাঠে মাঠে কাস্তের ফলায় রোদের ঝিলিক, ধানকাটার খস্ খস্ সর্ সর্ শব্দ। দ্রুততা আর ব্যস্ততা। চলল নাগাদ এক প্রহর রাত অব্দি। আর, রাতটা যদি জ্যোৎস্নার হয়, সবসময় কান পাতলে শোনা যাবে খামারে খামারে ঝাড়াই মাড়াইয়ের ধুপধাপ খড় খড় আওয়াজ। 'এট্টা সুরেল গপ্প বুলছেন মাঠঠাকুর'—রতুর আবিষ্কৃত উপমা। ওলাং গর্বিতা। 'এত জানে বাপু মরদটো।'

ওবেলার দিকে সময় করা মুশকিল রতুর পক্ষে। শীতের ভোরটা কেবল ফাঁকা। অথচ কয়েকটি দিন একঘেয়ে অনুযোগের পর রতু প্রস্তুত হতে পারল। 'তুই খুজেছিস্?' 'মিথ্যে বুলছি নাকি? মরশুমটা ইদিকে বয়ে যাচ্ছে চোখের পর দে খালিখালি। রাত্তিরে চোখের পাতাটি বুজিনে গো—ভাবনাতে।' ওলাং প্রায় কান্নার ঢঙে বিড়বিড় করেছিল। বীনাদিরা উদিকে দু হাঁড়ি ধান জমিয়েছে।' 'তুর নখে ধার নাই? শীষ ছিঁড়তে পারিস নে?' রতু ধমকাল। ওলাং অমনি চেঁচিয়ে একশো। হাত দুখানি বাড়িয়ে রতুর চোখের কাছে মেলে ধরল আঙুলগুলো। 'দ্যাখো মিন্‌সে, আমার নখগুলার দশা দ্যাখো! যন্তনায় মরে যাই সবসময়।' ওলাং-এর চোখ ছল ছল। আঙুলের ডগাগুলো হাতের চেটোয় নিয়ে পরখ করল রতু। 'আঃ ইগুলার যে মিত্যু হচ্ছেন রে বাপু!' রতু পস্তাল ওর ফাটাফাটা কালচে ঘেয়ো নখগুলো দেখে। 'কালই ভোরবেলা দয়ে ডুববো দেখে নিস্। এট্টা শামুক তুলবই তুর জন্যে।'

রতু এতক্ষণে ভুস্ করে ভেসে উঠেছে পানকৌড়ির মতো। 'পাতালপুরীতে আগুন জ্বলছে-এ-এ-এ!' কথাগুলো কাদার দলার মতো ছড়িয়ে পড়ছে বেহুলার আকাশে হিমময় হাওয়ায়।

'পেলে গো?'

আবার ডুবেছে। ওলাং জলের দিকে ঝুঁকে দাঁড়াল।

লাল রোদটা রোঁয়াওঠা ভেড়ার বাচ্চার মতো দেখাচ্ছে। কেননা হাওয়া

এল উত্তর থেকে মন্দ মন্দ এবং কুয়াশারা মিলিয়ে গেছে কিছু কিছু। ডিমের কুসুমটা গলে গলে সবকিছুতে মাথামাখি। অল্প একটু গরমের সুখ—হয়তো সবটুকুই ঐ তরল আলোটা দেখতে পেয়ে। আকাশের হলুদ দাঁতে দূরে উলুকাশের জঙ্গল ঘাসফড়িঙের মতো ছটফট করছে। একদল কাক বেহুলার আকাশে। ওলাং কাকগুলোর কুচকুচে চিকন ডানাগুলো দেখল মুখ তুলে। অন্যসময়ের মতো অমঙ্গলের চিহ্ন খুঁজল না এতে—বরং এখন সবকিছুই সুন্দর আর সহজ মনে হয়।

অথচ রতু ক্রমাগত ডুবছে আর উঠছে—ওলাং-এর সুন্দরটুকু এখানে এসে বারবার মরে যাচ্ছে। সুতরাং ওলাং টের পাচ্ছে সবসময়ই হাসির ঘরের বাইরে ধারাবাহিক একটা পীড়াবোধ থেকেই যায়—কখনো টের পায়, কখনো না। এবং যখনই টের পায় আরোগ্য খোঁজে। ওলাং রতুর শরীরের রক্তগুলোকে স্পষ্ট জমে যেতে দেখল। 'বেহুলার পাতালে মরদটো মানিক খুঁজছে, আহা রে', ওলাং-এর গলার নিচে থেকে এই দরদগুলো জিভ অব্দি পৌছে ওলাংকে কাতর করল। ওলাং মুখ তুলে চারপাশে শুকনো খড় খুঁজছে। রতু উঠে এলে ওকে চাঙ্গা করতে হবে আগুনে সেঁকে তাতিয়ে। রতু আবার ভেসে উঠতেই ওলাং চেঁচাল, 'থাক্ গে বাপু, উঠে এস'। কিন্তু রতু আবার ডুবেছে। যা জেদী আর ডাকাবুকো মানুষ। অগত্যা হাসতে ইচ্ছে করে ওলাং-এর।

আশেপাশে প্রচুর ব্যানাবন। কোথাও সর আর নলখাগড়া। সবই কাঁচা আর শিশিরে চবচব করছে। একটু দূরে পাহারাদার 'জাগাল'দের কুঁড়েটা। ওখানে আগুনের ধোঁয়া শীষ দিয়ে উঠছে সাপের লেজের মতো। এবং খড়ও মিলতে পারে দু আঁটি। ওলাং পরবর্তী কোনো ভাবনা না নিয়ে দ্রুত এগোল কুঁড়েটার দিকে।

কুঁড়ের গায়ে হেলান দিয়ে পুবমুখো বসে রোদ পোহাচ্ছে দুটি জাগাল। একটু থমকে দাঁড়াল ওলাং। বেহায়া জাম্বুটাও রয়েছে তাহলে। ওর কালোকুচ্ছিত চেহারা, থ্যাবড়া নাক, হাসের মতো থপথপিয়ে হাঁটা, ও মোটা মোটা দাঁতের কর্কশ হাসিগুলো পলকে পলকে বোধে পরিচিত চেহারা পাচ্ছে। সেদিন ওলাং-এর ধানকুড়োন ঝুড়িটা কেড়ে নিয়েছিল। এত তৈরি চোখ ছোঁড়াটার। আকাটা ধানের শীষ লুকিয়ে কাটতে গিয়ে এই ঝামেলা। একেবারে আচমকা ওর চ্যাপটা থাবায় ওলাং-এর ঝুড়ি, ওলাং লজ্জায় ভয়ে ঘেন্নায় কাঠ। ওলাং ফিসফিস করে বলেছিল, 'ইটো কী হলো জাগালের পো?'

জাম্বু প্রচণ্ড হাসল। 'ছিজ কল্লাম গো গুণীনের বেটি। মাঠের পুলিশ আমি, জানো না বুঝি?'

ওলাং নতমুখে ঘামছে। কেউ দেখে ফেললে কী ভাববে। রতু হয়তো ঘেন্নায় চেঁচাবে, 'তুই চুন্নী ওলাং?'

ওলাং বিড়বিড় করে বলল, 'ঝুড়ি ছাও।'

'কেনে, তুমার জননীটো তো বশীকরণ মন্তর জানে, তুমায় এট্টু শেখায় নি? ঝেড়ে ছাও না একখান, গলে জল হয়ে যাই মাইরি!'

ওলাং রেগে লাল। 'ঝুড়ি দেবে কিনা বল?'

'উঁহু।' জাম্বু লাঠিতে এক পা তুলে ত্রিভঙ্গ ঠামে দাঁড়িয়ে ছিল।

'সব শীষ তো লুকিয়ে কাটি নি। কুড়িয়েছি না?' ওলাং-কে কিছু নরম আর সপ্রতিভ হতে হলো।

'লতুন বৌর গলায় যেন মধু ঝরছে। আহা! আরো এট্টু লরম হও দিকি।'

ওলাং ফিক্ করে হেসে উঠল ওর ভঙ্গি দেখে।

'এই লাও।' জাম্বু ঝুড়িটা ফেলে দিয়েছিল। 'লতুন বৌ বুলে মাপ কল্লাম জেনো।'

ওলাং পালিয়ে বাঁচে।......

জাম্বু ঘাড় ফিরিয়েই ওলাংকে দেখতে পেয়েছে এবার। এবং হাসতে হাসতে উঠে দাঁড়িয়েছে। 'এস গো লতুনী।'

ওলাং হাসল। 'এট্টু আগুন ছাও তো জাগালের পো।'

'এত ভোরে মাঠে বেরিয়েছো, গতরটা যে ননীর তা জানো না?' জাম্বু মিষ্টি হতে চাচ্ছে। 'সেঁকবে বুঝি?'

'যাও!'

'আগুনে কী সেঁকবে?'

'লোকটো বেউলেতে ডুবছে ছাখো গে। এট্টু তাত লাগবে না?'

'আহা-হা, কাণ্ডটা ছাখো।' জাম্বু মুখোমুখি দাঁড়াচ্ছে। পাশের জাগালটি বুড়ো মানুষ। বসে বসে কাশছে। ওর ঝুলেপড়া চোখের পাতার নিচে তারা দেখা যায় না। 'মরদটো মল মোনের দুঃখে বেউলেয় ডুবে, ইনি তাই আগুন খুঁজছেন। ব্যাপারটা তলিয়ে ছাখো কেষ্টদা।' বুড়ো কী বলতে চেষ্টা করছে, বোঝা যায় না। উদ্দাম কাশির তোড়ে ঝুঁকে ঝুঁকে পড়ছে। ওলাং কষ্টটা দেখতে পারছে না।

'ছাও না বাপু, দেরি হলে মুখ করবে।'

'উই যে বুঁদিতে জলছে, চোখ নাই তুমার ?' জাম্বু খড় পাকিয়ে তৈরি বুঁদিটা দেখিয়ে দিল। 'এট্টুখানি ভেঙে লাও। নৈলে আমরা আবার উপোসে মরব।'

ওলাং বুঁদির ডগাটা মোচড় দিয়ে ভেঙে নিচ্ছে। বুড়ো একবার দেখল। কী যেন বলল। বুড়ো হয়তো ভাবছে তার জীবনেও এমন অনেক সকাল এসেছিল। ওলাং বসে থেকেই জাম্বুর দিকে তাকিয়ে বলল, 'চাট্টি খড়ও দিতে হবে কিন্তু।'

'খড় ?' জাম্বু জাগাল মাথা নাড়ছে। 'সম্বচ্ছর মাঠ আওলে দুপন খড় পাইনে। মাপ করো লতুন বৌ।'

'দুটি আঁটি নেবো। বেশি না।' ওলাং সাহসিকা হয়ে উঠেছে। পায়ে পায়ে এগোচ্ছে পালার দিকে। বুড়ো আবার দেখল। তারপর কাশতে থাকল চোখ বুজে। জাম্বুর চোখে পলক নেই। থমকে দাঁড়িয়ে বিড়বিড় করছে, 'কোথেকে এরা সব আসে', এবং 'অনেক কষ্টর দব্য লতুনী, লোকটোর দশা দেখছ ? আমিও একদিন বুড়িয়ে যাব এই মাঠে।'...জাম্বু তারপর বোবা হয়ে গেল।

'কী দেখছ জাগাল ?' ওলাং দু আঁটি খড় বগলে পুরে মিষ্টি হাসল।

জাম্বু এবার নড়তে পারছে। শীতের মাঠে যেন একটা আকস্মিক কিছু ঘটে গেল। কাল সারাটি রাত বড়ো কষ্টে গেছে। শীত আর স্বপ্ন। ওরা ওকে সারারাত ধরে দলেপিষে একাকার করেছে। জাম্বু বড়ো বড়ো চোখে ওলাং-কে দেখছে।

'বুললে না তো ?' ওলাং জাম্বুকে কিছু তোয়াজ করতে চায়।

'তুমার রূপ।' জাম্বু শব্দ করে হাসল। 'মাঠকন্যের রূপ দেখলে শীতের হাওয়া গায়ে লাগে না।'

'ইস্!'

'আবার এসো লতুনী।'

'কেনে ?'

'এমনি বুলছি।'

'যাও!'

'আর এট্টু হেসে যাও না বাপু, রাত্তিরটায় বড্ড শীত ছিল। আম্মো এট্টু গতরখান্ সেঁকে লিই।'

ওলাং আরো মিষ্টি করে হাসল। ওলাং চলতে চলতে শুনল জাম্বুর স্বর: 'বেশ খানিক তাত পেলাম গো কেষ্টদা। যা এট্টু সোস্থ হওয়া গেল। ঠিক বুলিনি ?'

'বড্ড বোকা এই ছোক্‌রা জাগালটা। ভারী ঠকিয়েছি।' ওলাং গল্পটা রতুকে একটু ফেনিয়ে ফাঁপিয়ে শোনাবে। 'আবার এসো।' 'আসবো বৈকি, মানুষের দোরে কাজ বাধলেই মানুষ আসে।' ওলাং-এর মনে জাম্বু আর ওলাং এমনি করে কথা বলছে পরস্পর। দুটিতে ফিস্‌ফিস্ করছে। 'তারপর লতুনী, তার পরেরটা ?' 'তারপর কী ? কিচ্ছু না, কিচ্ছু থাকতে নাই।' 'শুধু এইটুক ?' 'হ্যাঁ গো জাগাল, হ্যাঁ। তুমি এট্টুখানি তাতলে, আম্মো তাতলাম, ব্যস্, নটেগাছটি মুড়ুলো।' 'তা বটে বাপু, বসুমতীর পিষ্ঠে যা শীত চলেছেন!' ওলাং-এর জাম্বু আশ্চর্য শান্তিতে দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে।

রতু বেহুলার জল থেকে কখন উঠে গুটিসুটি বসে রয়েছে রোদে পিঠ দিয়ে। ওলাং-এর পায়ের শব্দ শুনে একবার শুধু ঘাড় ফিরিয়ে ওকে দেখল।

'পেয়েছ গো ?' ওলাং খড়গুলোর বাঁধন খুলে এলোমেলো ছড়াতে থাকল। 'এসো দিকি ইদিকে। বড্ড কাহিল হয়ে যেয়েছো বাপু। আগুন পোয়াবে এস।'

রতু কথা বলতে পারছে না হয়তো।

'ওম্মা, জমে বুঝি পাথরটি ?' ওলাং এগিয়ে এসে ওর পিঠে হাত রাখল। 'আহা, কী হিম! ওঠ, ওঠ, গতরখান তোলো দিকি। নাকি ইখেনেই জালবো ? ইখেনে কতো নোংরা যে'...ওলাং নাকে কাপড় ঢাকছে কিছু নোংরা দেখে।

রতু গুঁড়ি মেরে অল্প অল্প দুলছে শুধু। লোকটার হল কী—ওলাং অবাক। ওলাং অবাক হয়ে বেহুলার স্রোতশায়ী হিম জলে বুজকুড়িগুলো তখনো ভাঙতে থাকা দেখতে পাচ্ছে। ওলাং খড়গুলো রতুর পিঠের কাছে বয়ে আনছে। রতু উঠে দাঁড়াল।

ওলাং ওর কঠোর মুখের দিকে চেয়ে বলল, 'কী হয়েছে, বুলবে না ?'

রতু একটু কাশল। তারপর ধোঁওয়াওঠা আগুনের শিখাগুলো দেখল। 'ওলাং!'

'হুঁ।'

'অনেক শীত আমি দেখেছি রে, গতরটা অনেক থোয়ারে গড়া।' রতু কি

কেঁদে ফেলবে। ছি, ছি, এমন যুবোজোয়ান মরদটার গলায় শীতের দাঁত বসে কেমন হয়ে ওঠে দেখি। ওলাং ওর গায়ে তুলোর ছেঁড়া চাদরটা চাপিয়ে দিল।

'এবার বসো তো এট্টু।' ওলাং হাসতে থাকল। জাম্বুর গপ্পটা বলবে ভাবল।

'জাগালের কাছে খড়গুলা মাগনী মিলল, তাই না? আমার দুটি চোখ রয়েছে ওলাং।'

আঃ আঃ, আচমকা বেহুলার হিম দহ ওলাং-এর চারপাশে। ওলাং ডুবে যাচ্ছে। ওলাং বুক চেপে ধরে ককিয়ে উঠেছে। ওলাং-এর পিঠের কাছে রতুর উদোম শরীর—চাদরটা খসে পড়েছে কখন। রতু ওকে তীব্রদৃষ্টে খুঁটিয়ে দেখছে।

'একা ছাড়াপাখির মতো মাঠে মাঠে উড়িস, আমার শংকা হয়।'

ওলাং উঠে দাঁড়াল। জলন্ত খড়গুলো তুলে নিয়ে বেহুলায় ছুঁড়ে ফেলতে গেল। রতু ওর হাত চেপে ধরেছে। রতুর বুকের কাছাকাছি শিখাগুলো দুলছে। রতু কিছু ভাবছে শিখাগুলো দেখে।

কাঁপানো গলায় ওলাং বলতে পারল, 'আমার পেটে একটা পুকড়ো রয়েছে, আমি ভুলি নে—ভুলবো না ইটো জেনে রাখো তুমি।' এবং খড়গুলো স্খলিত হয়ে ওদের পায়ের নিচে হু হু জলে উঠলে প্রচুর উষ্ণতা ক্রমান্বয় স্পর্শ দিয়ে দিয়ে একটু করে অন্যবিধ বোধ জাগাতে জাগাতে কখন কোন এক সময়ে দুজনে আরো ঘন হয়ে বসে রতু ওলাং-এর সুমুখে একটি সোনালী শামুক তুলে ধরতেই দুজনে স্পষ্ট দেখল শামুকটার পিঠে গোলাকার গুটিকয় বৃত্তরেখা—রেখার উৎস খুঁজতে খুঁজতে আগুনটা যখন প্রায় নিবু নিবু, ওদের শরীরে পর্যাপ্ত তাপ সঞ্চারিত হয়েছে, রতু হাসতে হাসতে বলল, 'দেখছিস্ ওলাং, গোল আঁকগুলো দেখতে অনেক মনে হয়, কিন্তক মোটে একটি ছাড়া দুটি না।'

দুজনে শামুকটা শীতকালীন নিস্তেজ রোদে মেলে নিশ্চিত আরামে আবার হাসতে পারল।

স্বামী বিবেকানন্দ জন্মশতবার্ষিকী

গোপাল হালদার

একশত বৎসর পূর্বে স্বামী বিবেকানন্দ জন্মেছিলেন। একশত বৎসর পরে আজ যখন আমরা স্বামী বিবেকানন্দকে স্মরণ করি তখন স্মরণ করি তাঁকে একশত বৎসরের ইতিহাসের আলোকে। চির নবায়মান ভারত-জীবনের এক বীর্যময় অভ্যুদয় স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ; বিশ্বজীবনের মহান রহস্যের এক জটিল পরিচয় ও আশ্চর্য নির্দেশ সে জীবনে আভাসিত।

স্বামী বিবেকানন্দের জীবন মাত্র ৪০ বৎসরের। পূর্ণ ৪০ বৎসরও নয়—ইং ১৮৬৩-এর ১১ই জানুয়ারি থেকে ইং ১৯০২-এর ৪ঠা জুলাই পর্যন্ত। এরই মধ্যে নরেন্দ্রনাথ দত্ত স্বামী বিবেকানন্দ হয়ে উঠেছিলেন। নিছক ব্যক্তি-জীবনের কথা রূপেও তা একটি চমকপ্রদ কাহিনী। আর তার তাৎপর্য বুঝলে দূর-দূরান্তরের মনীষীকেও প্রীতিতে শ্রদ্ধায় মহৎ অনুভূতিতে উদ্বুদ্ধ হতে হয়। তার প্রমাণ রমাঁ রলাঁ।

নিশ্চয়ই বিবেকানন্দকে নানা দিক থেকে দেখা চলে। কারণ, বহুমুখী ছিল তাঁর প্রতিভা, আর তাঁর ব্যক্তিত্ব আপনার বিকাশের দাবিতেই দলের পর দল ছাড়িয়ে পরিণত প্রকাশ লাভ করেছে। তার প্রত্যেকটি খণ্ডই তাঁর ব্যক্তিত্বের সাক্ষ্য, পরিণতির অবলম্বন ও আশ্রয়। তাই বহুদিক থেকে তাঁকে দেখা সম্ভব, আর সে দেখার প্রয়োজনও আছে। একই কালে তিনি অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসী : "জগৎকে যদি আমাদের কিছু জীবনপ্রদ তত্ত্ব শিক্ষা দিতে হয় তবে তাহা এই অদ্বৈতবাদ।" আবার, তিনি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভক্ত শিষ্য : "যদি সেই মূর্তিপূজক ব্রাহ্মণের পদধূলি আমি না পাইতাম, তবে আজ আমি কোথায় থাকিতাম?" শুধু সগুণ ব্রহ্মোপাসনা নয়, চিরাগত পূজায় ও জীববলিতেও তাঁর আপত্তি নেই। অথচ তাঁরই মুখে শুনি, "কারও আদেশে বিশ কোটি দেবদেবীতে অন্ধভাবে বিশ্বাস করার অপেক্ষা যুক্তিকে অনুসরণ করিয়া যদি মানবজাতি নাস্তিক হয়, তাও ভালো।" তিনি অসামান্য কর্মযোগী, অতি প্রবল এক সন্ন্যাসী মণ্ডলীর প্রতিষ্ঠাতা। অথচ এই তাঁর পরম উপলব্ধি : "আমার

জন্য প্রার্থনা কর, জো, যেন চিরদিনের তরে আমার কাজ ঘুচে যায়, আর আমার সমুদয় মনপ্রাণ যেন মায়ের সত্তায় একেবারে লয় হয়ে যায়। তাঁর কাজ তিনিই জানেন।" সেই মুখেই লোকসেবার দাবিতে আবার শুনি, "মুক্তি নাই বা হলো। দু'চারিবার নরককুণ্ডে গেলেই বা।" এবং "যার পেটে ভাত নেই তার আবার ধর্ম কি?" তিনি মায়াবাদী সন্ন্যাসী, আবার তিনিই স্বদেশপ্রীতির উদ্‌গাতা, তিনিই জাতীয় আত্মশক্তির মন্ত্রের বীর্যবান সাধক; "ভারতের মাটি আমার পরম স্বর্গ" এই তাঁর ঘোষণা। "আগামী পঞ্চাশ বৎসরের মতো এই হবে আমাদের মূল সত্য—এই আমাদের দেবী ভারতমাতা। অন্য সব ফাঁকা দেবতারা আমাদের মন থেকে বিদায় নিন্। এই একমাত্র দেবতা যে জীবন্ত—আমার স্বজাতি,—তাঁর হস্ত সব দিকে, তাঁর পদ সব দিকে, সব দিকে তাঁর কর্ণ—সে সকলকে ব্যপ্ত করে আছে।" একদিকে শুনি, "এই অদ্বৈতবাদ কার্যে পরিণত না হইলে আমাদের এই মাতৃভূমির আর উদ্ধারের আশা নাই।" অন্যদিকে "জড়বাদ (মেটিরিয়ালিজম্) এক অর্থে ভারতবর্ষকে মুক্ত করেছে—জীবনের দুয়ার সকলের সম্মুখে উন্মুক্ত করে, জাতির একচ্ছত্র আধিপত্য বিনষ্ট করে, যা মুষ্টিমেয় লোকের কবলিত ছিল আর যারা তা প্রয়োগ করতেও ভুলে গিয়েছিল সেই অমূল্য জ্ঞানভাণ্ডারকে সকলের আলোচ্য করে।" "এখন চাই লোহের মতো পেশী, ইস্পাতের মতো স্নায়ুতন্ত্রী"। তিনি পলিটিক্‌সে বীতশ্রদ্ধ। অথচ তিনিই তাঁর প্রিয়তম শিষ্যাকে আপন সৃষ্ট প্রতিষ্ঠান ত্যাগ করে ভারতীয় বিপ্লবের সাধনায় উৎসর্গ করে যেতে কুণ্ঠিত হলেন না। ইউরোপীয় সভ্যতার বিলাস মোহে যিনি ঘৃণা করেন, তিনি পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার কাছ থেকে চাইলেন রজোগুণের অনুশীলন, শক্তির সাধনা—চাইলেন পূর্ব ও পশ্চিমের মিলন, বিশ্বমানবের ভ্রাতৃত্ব—"আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান, আন্তর্জাতিক সমবায়, আন্তর্জাতিক বিধিব্যবস্থা—এই হল এ যুগের দাবী।" আবার সেই সঙ্গেই মানুষের অধিকারের পূর্ণতর বোধে উদ্দীপ্ত হয়ে তিনি চাইলেন দরিদ্র নারায়ণের সেবাতেই ধর্ম, তারপর একেবারে দারিদ্র্যের মূলোৎপাটন—বললেন পৃথিবী-জোড়া শূদ্র-অভ্যুদয়ের প্রয়োজন ও অবশ্যম্ভাবিতা।

এই বিচিত্র প্রতিভাকে এসব কোনো একটি বিশেষ ক্ষেত্রে দেখাও সম্ভব, বহুদিক থেকে দেখা কিন্তু ততোধিক প্রয়োজন। তা হলেই সেই ব্যক্তিস্বরূপকে সমগ্র করে, অখণ্ড প্রকাশরূপে দেখা সম্ভব হয়। আর সেই প্রয়োজনও সার্থকভাবে সম্পাদিত হতে পারে যদি ইতিহাসের প্রকাশমান

পরিপ্রেক্ষিতে এই ব্যক্তিসত্তার প্রকাশকে দেখি। বিবেকানন্দের পরিচয় তখনি সম্পূর্ণ হয়ে ওঠে।

ভারতের নবজাগরণের রূপ

একশত বৎসর পূর্বে বিবেকানন্দ যখন কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন তখনকার দিনের মোট রূপটা আজ সাময়িকতার আবরণ থেকে মুক্ত হয়ে আমাদের চক্ষে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। মানুষের ইতিহাসে সাম্রাজ্যবাদ তখন শাসনের ঔদ্ধত্য ও শোষণের নৃশংসতা নিয়ে প্রকাশিত হতে চলেছে, আর তারই সঙ্গে সঙ্গে নিপীড়িত দেশ ও শোষিত জাতির মধ্যে জাগিয়ে তুলছে জাতীয় চেতনা, জাতীয় আত্ম-প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক প্রয়াস। উনবিংশ শতাব্দীর এই শেষ পাদ আন্তর্জাতিক দৃষ্টিতে যেমন সাম্রাজ্যবাদের পর্ব, তেমনি এ দেশের ইতিহাসে জাতীয় চেতনারও উন্মেষ কাল। ভারতবর্ষেই প্রত্যক্ষ হয়ে উঠছিল ইতিহাসের এই দ্বৈত রূপ। বিশেষ করে তা প্রত্যক্ষ হয়েছিল বাঙলা দেশে, কলকাতায় শিক্ষিত সমাজের মধ্যে। ঠিক ইং ১৮৬০-এর সময়ে বাঙালী জীবন আধুনিক যুগের প্রস্তুতি-পর্ব (ইং ১৮০০—১৮৫৮) ছাড়িয়ে প্রকাশের পর্বে (ইং ১৮৫৯—) উত্তীর্ণ হয়। রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত যে ভারতের তথা বাঙলার নবজাগরণের ধারা তার মধ্যভাগে রবীন্দ্রনাথের মতোই বিবেকানন্দের জন্ম। বিবেকানন্দেরও কৈশোর ও বাল্যের উপর দিয়ে নবজাগরণের ধারা জোয়ার তুলে চলে যায়। তাঁর যৌবন প্রত্যক্ষ করে সেই নবজাগরণের যৌবনজলতরঙ্গ—যার সম্বন্ধে তখনো এই অনুভূতি তাঁর চারিদিকে দেখা দিয়েছে "এ যৌবন-জলতরঙ্গ রোধিবে কে?"

আমাদের সেই নবজাগরণের মধ্যে অভাব-অপূর্ণতাও অনেক ছিল। না হলে 'ভারত' ও 'পাকিস্তানে'র উদ্ভব হলো কিরূপে? দেশের সাধারণ মানুষের শোষণ-জ্বালায় ও স্বতঃস্ফূর্ত সংগ্রামে সেই নবযুগের রাজনৈতিক নেতৃত্ব সক্রিয় ভাবে সাড়া দিতে পারল না কেন? কি কারণে জীবনের বাস্তবক্ষেত্রে আর্থিক ও বৈজ্ঞানিক উদ্যোগে তাদের প্রয়াস এমন খর্বিত রইল? অভাব ছিল সেই নবযুগের মধ্যে, ছিল সেই সঙ্গে তাতে আভ্যন্তরীণ দ্বিধাদ্বন্দ্বও। শুধু এইটুকু মনে রাখলেই ভারতীয় নবজাগরণের এই জটিলতা ও স্ববিরোধিতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে; যাঁরা সেদিন আধুনিক জ্ঞানে-বিজ্ঞানে অগ্রসর—পরবর্তী কালের নিকষে যাঁদের বলতে পারি 'লিবারল বুর্জোয়া' ভাবে প্রভাবিত, সামন্ততন্ত্রের বিরোধী—

তাঁরাই অধিকাংশে সাম্রাজ্যবাদের স্বরূপ সম্বন্ধে দেখি তখন অচেতন, আত্মশক্তিতে আস্থাহীন। আবার, যারা সবচেয়ে বেশি জাতীয় আত্মমর্যাদায় প্রবুদ্ধ—পরবর্তী কালের নিকষে যাদের বলতে পারি 'ন্যাশনালিষ্ট'—স্বাধীনতার প্রয়াসে উৎসাহী —তারাও প্রায়ই জাতীয় গৌরবের নামে সামন্ততন্ত্রের মোহগ্রস্ত, আত্মপ্রবঞ্চিত, আধুনিকতা অপেক্ষা অতীতের পুনরুজ্জীবনে তাদের অধিক আগ্রহ। সত্য বটে, যে কোনো বড় আন্দোলনের মধ্যেই এরূপ জটিলতা ও অন্তর্বিরোধ থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু অন্তর্দ্বন্দ্বকে সার্থকভাবে নিরসন করাতেই আন্দোলনের সার্থকতা। একথাও ঠিক, পরাধীন জাতির নবজাগরণের পক্ষে তা সম্ভব হয় নি, হয় না। একটা অন্তর্বিরোধকে ভেতরে-বাইরে পোষণ করেই আমাদের নবজাগরণের চেতনাও অগ্রসর হয়েছে। তবু সত্য এই যে—সে অগ্রসর হয়েছে, স্তব্ধ হয়ে যায় নি। হয়তো ইতিহাসের ক্রমবর্ধিত ঘাত-প্রতিঘাতে তাও অনিবার্য ছিল, কারণ সাম্রাজ্যবাদও নিজের নিয়মেই হয়ে উঠেছিল 'ইতিহাসের এই অচেতন অস্ত্র—ভারতীয় সামন্ততন্ত্রকে তা নিঃশেষ করে দিয়েছে। আর আপনার অনিচ্ছায়ও এই বিপর্যস্ত শোষিত জাতির চেতনায় জাগিয়ে তুলেছে আত্মবিকাশের স্বপ্ন—বুর্জোয়া শিক্ষাদীক্ষা, জীবনযাত্রা আয়ত্ত করার অভিলাষ —হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠার (ইং ১৮১৭) পর থেকে যা ক্রমশই ব্যাপক ও প্রবল হয়ে উঠেছিল।

অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবেই এই বুর্জোয়া মতাদর্শকে সেদিন 'পাশ্চাত্ত্য' বলে গণ্য করা হয়েছে, এখনো হয়। কারণ পাশ্চাত্ত্য ভূমিতে, বিশেষ করে ইংলণ্ডেই, বুর্জোয়া ভাবনা ও ব্যবস্থার প্রথম উদ্ভব ও বিকাশ ঘটে। এই ভাবনার ভাবুকদের নাম তাই এদেশে যেমন হয়েছে 'পাশ্চাত্ত্যপন্থী' ('অক্সিডেন্টালিস্ট', রুশ দেশে যেমন নাম হয়েছিল 'ওয়েষ্টার্ণাইজারস্',), তেমনি তাদের প্রতিপক্ষীয়দের নাম এদেশে হয়েছিল 'প্রাচ্যপন্থী' ('ওরিয়েন্টালিষ্ট', রুশ দেশে যাদের সগোত্র ছিল 'স্লাভেফিল', 'রুশোফিল্' গোষ্ঠী)। আজ অবশ্য আমরা জানি যে এই মতাদর্শ কোনো দেশের বা জাতির সম্পত্তি নয়। তা ইতিহাসেরই পরিণতি, সমাজ-বিকাশের একটা বিশেষ পর্ব। তাই তাকে 'বুর্জোয়া মতাদর্শ' বলাই বিজ্ঞান-সম্মত,। অন্তত 'পাশ্চাত্ত্য' বলা অপেক্ষা 'মডার্ন' বা 'আধুনিক' বললে (কিম্বা 'ফিউডাল' বলা অপেক্ষা 'মিডিয়েভাল বা 'মধ্যযুগীয়' বললেও) ততটা বিভ্রান্তির কারণ থাকে না। হয়তো স্বামী বিবেকানন্দের দিনেও থাকত না।

বিবেকানন্দের জন্মের পূর্বেকার প্রায় চল্লিশ বৎসরে এই 'পাশ্চাত্ত্য' ভাবধারা, জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে নূতন জিজ্ঞাসা—যুক্তিবাদী বিচার, 'মানুষের অধিকার' সম্বন্ধে অনুভূতি, ব্যক্তিগত ও জাতিগত স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা, মানব-মহিমায় আস্থা প্রভৃতি বুর্জোয়া মানবিক মূল্যমান—এই পরাধীন জাতির বিশেষ বাস্তব ও মানসিক অবস্থায় বেঁকে-চুরে নানা পথে এসে এই 'প্রাচ্য' দেশের শিক্ষিত শ্রেণীকে আলোড়িত ও উদ্বেলিত করে তোলে—নানা কর্মেও তাদের চঞ্চল করে দেয়। 'পাশ্চাত্ত্য' বলেই ভারতীয় নবজাগরণের মধ্যেও নানা জটিলতা ও আবর্ত সৃষ্টিও ছিল তাই অনিবার্য।

জাগরণের ত্রিধারা

ইউরোপে বুর্জোয়া মতাদর্শ বা আধুনিক যুগধর্ম বিকাশ লাভ করেছিল তার সমাজ থেকে। প্রায় তিনশত বৎসর ধরে রেনেসাঁস, রিফর্মেশন ও ফরাসী বিপ্লবের তিন-তিনটি বৃহৎ পর্ব পেরিয়ে তা পরিণতি লাভ করে। আমাদের দেশে তা এল বাইরে থেকে আগন্তুকরূপে ; সাম্রাজ্যবাদের শাসন-শোষণের অস্ত্রসজ্জায় সজ্জিত হয়ে। তদুপরি একেবারে একসঙ্গে আমরা তার পরিণতরূপকে দেখলাম উনিশ শতকে, একই কালে আমরা তার তিন চার শত বৎসরের দানের সম্পূর্ণ ফলভাগী হবার জন্য পাগল হয়ে উঠি। আমাদের নবজাগরণের প্রবাহ-মধ্যে তাই সেই রেনেসাঁসের সাংস্কৃতিক চেতনা ও উদ্যোগ, রিফর্মেশনের ধর্মসংস্কার ও সমাজ-সংস্কার, আর ফরাসী বিপ্লবের রাষ্ট্রীয় অধিকারবোধ এই ত্রিধারা মিশ্রিত হয়েছে, আবর্ত সৃষ্টি করেছে, আবার বিশিষ্ট ধারায় প্রবাহিত হতে-হতেও সেই নব-জাগরণের মধ্যে সংযুক্ত থেকে নবজাগরণের সমগ্র প্রবাহকেই প্রবলতর করে তুলেছে। রামমোহন রায় থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত এই কালটিকে সমগ্রভাবে দেখলে আমরা এই জটিলতা বুঝতে পারি। রামমোহন একই কালে রেনেসাঁসের সাংস্কৃতিক চেতনার বাহন, রিফর্মেশনের সংস্কার-আন্দোলনের পুরোধা, ফরাসী বিপ্লবের রাষ্ট্রীয় অধিকার-বোধের সমর্থক। এই ত্রিধারা তার পরে যতই বিকশিত হলো ততই কতকটা বিশিষ্ট হলো, কারণ বিকাশ অর্থ ই বিশিষ্টতা-অর্জন। তাই রামমোহনের পরে এই ত্রিধারার সামঞ্জস্য আর কারো মধ্যে অমন করে পাওয়া গেল না—পাওয়ার কথাও নয়। রামমোহনের যুক্তিবাদ ইয়ং-বেঙ্গলের ও বিদ্যাসাগর-অক্ষয়কুমারের ধারা বেয়ে একদিকে অগ্রসর হয়। অন্যদিকে রামমোহনের সংস্কার-প্রেরণা দেবেন্দ্রনাথ-কেশবচন্দ্রের মধ্য দিয়ে সমুজ্জ্বল হয়ে

ওঠে। আর তাঁর রাষ্ট্রীয় চেতনা ইয়ং-বেঙ্গল, যুবক দেবেন্দ্রনাথ ও রামগোপাল
ঘোষ, হরিশ মুখুজ্জের মধ্য দিয়ে বাহিত হয়ে এলেও যে অপেক্ষাকৃত অস্পষ্ট
ও দুর্বল থেকে যায়—১৮৫৭-এর দিকে তাকালে তা অস্বীকার করা যায় না।
এই ত্রিধারার থেকে তথাপি কেউ একেবারে বিযুক্ত নয়—প্রত্যেকেরই জীবনে
এক বা দুইধারা মুখ্য, অন্যটি গৌণ। এবং এই ত্রিধারার সম্মেলন ঘটে আবার
স্বদেশীর যুগে, বিবেকানন্দের প্রেরণায় (যখন বিবেকানন্দ মরদেহে আর নেই),
এবং রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে—যখন রবীন্দ্রনাথ (১৯০৭-এর পরে) পূর্ণতর পরিণতির
পথ তার সম্মুখে নির্দেশ করেন,—সেই পরিণতি অবশ্য এখনো অনায়ত্ত।

স্বাজাত্যপ্রেরণার প্রবাহ

বিবেকানন্দের জীবন-কালেও একই সময়ে দেখি এই ত্রিধারার প্রবল বিকাশ।
বিবেকানন্দের জন্মলগ্ন আধুনিক বাঙলা সাহিত্যের জন্মলগ্ন—তাঁর বাল্য ও
কৈশোর মধুসূদন-বঙ্কিমের প্রতিভার প্রকাশে উজ্জ্বল। তাঁর যৌবন রবীন্দ্রনাথের
সমুদিত আলোকচ্ছটায় প্রদীপ্ত। অন্য দিকে, ঠিক সেই সময়েই সংস্কার আন্দোলন
তার শেষ গৌরবের পর্বে প্রবেশ করছে—কেশবচন্দ্রের নেতৃত্বে। আর প্রায় সঙ্গে
সঙ্গে (ইং ১৮৭৫-এর সময়ে) তা ভারতের নিজস্ব ঐতিহ্য ও আত্ম-সংস্কারের ও
আত্মপ্রকাশের পথ আবিষ্কার করছে পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণর সাধনায়। তৃতীয়ত,
জাতীয় মেলা ও ভারতসভাকে অবলম্বন করে রাষ্ট্রীয় চেতনা আপনাকে রূপায়িত
করবার দিকেও অগ্রসর হয়ে যাচ্ছে। বিবেকানন্দের কৈশোর ও যৌবনে
জাগরণের সকল ধারাই তাই উজান বইছিল। তাতেই বিবেকানন্দের জীবনে
এত বৈচিত্র্য, এত জটিলতা, এত অপাত দ্বিধাদ্বন্দ্বও স্থান পেয়েছে।

তথাপি ইং ১৮৯৩ থেকে ১৯০৩ থেকে পর্যন্ত কালটিকেই বলা যায় বিবেকানন্দের
জীবনকাল—তার পূর্বেকার জীবনটা তাঁর পূর্বজীবন, প্রস্তুতির জীবন। সেই
দশ বৎসরে তিনি সম্পূর্ণ সুসংগঠিত অদ্ভুতকর্মা পুরুষ, সেই দশ বৎসরে স্পষ্টতই
তিনি সন্ন্যাসী ও সুসংগঠিত ধর্মান্দোলনের নেতা। সেই দশ বৎসরে কিন্তু
বাইরের রাজনীতিতেও একটা প্রবল পরিবর্তন ঘটছিল,—ইং ১৯০৪-১৯০৫-
এর পৌছে—তাতে আর সন্দেহ রইল না। সে পরিবর্তন কী? বলা যেতে পারে,
ভারতীয় রাজনীতি লিবারলদের প্রভাব কাটিয়ে তখন (১৮৯৩—১৯০০)
জাতীয়তাবাদীদের হাতে আপনার দায়িত্বভার দিচ্ছিল। তিলক ও অরবিন্দের
আবির্ভাবে তাই সূচিত হয়। আসলে 'জাতীয়মেলা'র মধ্যেই ছিল এই রাজ-

নীতিরও বীজ। শুধু কি রাজনীতিতেই? সাহিত্যে ও রবীন্দ্রনাথ 'সাধনা'র পর্বে
প্রবেশ করলেন এই কামনা নিয়ে 'এবার ফিরাও মোরে'। স্বদেশচিন্তায়, সমাজ-
চিন্তায় সাহিত্যক্ষেত্র থেকেও তিনি আত্মশক্তির মন্ত্র গ্রহণ করলেন। তাঁর
জীবনেও এটা স্বাজাত্যের পর্ব।

ধর্মান্দোলন ও সমাজ-সংস্কারের আন্দোলন তার পূর্বে (১৮৭৫) মোড় ঘুরে
গিয়েছিল (১৮৭৫—৯০) এই ভারতীয় আত্মমর্যাদার ও আত্মপ্রতিষ্ঠার চেতনায়।
আসলে ভূদেব ও বঙ্কিমের মধ্যেও কি ভারতীয় ধর্ম ও সমাজের সেই
আত্মসংস্কারের প্রয়াস দেখা যায় না—রাধাকান্ত দেব প্রভৃতির 'ধর্মসভা'র প্রচেষ্টা
থেকে যা স্বতন্ত্র? যা হিন্দু কাউন্টার রিফর্মেশনেরই তুল্য? শাস্ত্রকে বুদ্ধির
দ্বারা, যুক্তির দ্বারা শোধনের চেষ্টা রামমোহনও অবজ্ঞা করেন নি,
দেবেন্দ্রনাথও না। কিন্তু সংস্কার আন্দোলন আপনারই গতি নিয়মে সেই মধ্য
পথে আবদ্ধ থাকতে পারে নি, যুক্তিকেই প্রাধান্য দিয়ে এগিয়ে গিয়েছে,—
'ইয়ং বেঙ্গলের' মতো দুঃসাহসে নয়, কেশবচন্দ্রের মতো সৎসাহসেই। সাধারণ
ব্রাহ্মসমাজ সেই সৎসাহসের বশেই ভক্তিপ্রবণ কেশবচন্দ্রকে পিছনে ফেলে
গেল (১৮৭৮)—'সাধারণ' হবার শুভ যুক্তিতে। কিন্তু এই যুক্তিবাদের স্রোত
শুধু শাস্ত্র ও আচার-বিচারকেই ভাসিয়ে দিয়ে ক্ষান্ত থাকে নি—ভারতীয়
সমাজ, ভারতীয় ঐতিহ্য, ভারতীয় মর্যাদাবোধকে অনেকটা ক্ষয় করে
দিয়েই ব্রাহ্মসমাজ এগিয়ে চলে। বুর্জোয়া জীবনাদর্শের নামে পাশ্চাত্ত্য আচার-
নিয়ম, সমাজ-রীতিকে বরং ব্রাহ্মকর্তৃত্ব অনাবশ্যক মূল্য দিয়ে বসে। ভারতীয়
সাধারণ মানুষের থেকে ও সাধারণ জীবনযাত্রার ঐতিহ্য থেকে সাধারণ ব্রাহ্ম-
সমাজ তাই প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে। ফলে, ভূদেব ও বঙ্কিমের মধ্যে যার আভাস
দেখি সেই জাতীয় আত্মসম্ভ্রমবোধ, জাতীয় সংস্কৃতির চেতনা ধর্মে ও সমাজে
আত্মসংস্কার ও আত্মপ্রকাশের দায়িত্ব নিয়ে শতাব্দীর শেষ পাদে মাথা খাড়া
করে উঠল। তার একটা উদ্ভট চেষ্টা থিয়োসোফিক্যাল সোসাইটিতেও
তখন (১৮৭৮) দেখা গিয়েছিল। কিন্তু তার প্রকৃত প্রতিষ্ঠা ঘটে উত্তরভারতে
'আর্যসমাজে'র আন্দোলনে, আর বাঙলা দেশে শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবে। বুর্জোয়া
মতাদর্শকে পাশ্চাত্ত্য রীতিনীতির সঙ্গে এক করে দেখাতেই ব্রাহ্মসমাজ নরেন্দ্র
দত্তকে তৃপ্ত করতে পারে নি—হিউম্, মিল স্পেন্সারের যুক্তিবাদও যেমন তাঁকে
সম্পূর্ণ অবদ্ধ করে রাখতে পারে নি। অথচ রামমোহনের অদ্বৈত-ভাবনা,
সংস্কার-ভাবনা, বিবেকানন্দ হয়েও তিনি তুচ্ছ করতেন না। তিনি ত্যাগ করলেন

ভারতীয় লিবারল্ বা 'সংস্কার'বাদীদের ভূমিভ্রষ্ট নিরলম্বতা, গ্রহণ করলেন সেই জাতীয় ঐতিহ্য, সাধারণের সঙ্গে একাগ্রতা, জাতীয় আত্মসংস্কার ও জন-সমাজের আত্মপ্রতিষ্ঠার ব্রত। বিবেকানন্দের সঙ্গে কিন্তু ধর্ম ও সমাজক্ষেত্রে যোদ্ধবেশে আবির্ভূত হলো 'এ্যাগ্রেসিভ্ হিন্দুইজম্', যা শুধু ভারতীয় ন্যাশনালিজম নয়, সেই সঙ্গে কতকাংশে হিন্দু রিভাইভালিজম্ও। শ্রীরামকৃষ্ণ সেখানে যুগাবতার, বিবেকানন্দ তার দিগ্‌বিজয়ী মহারথী।

মূল কথা, নবজাগরণের ধারা শতাব্দীর শেষভাগে (ইং, ১৮৭৫-১৯০০) মানুষের অধিকারবোধ ও জাতীয় অধিকারবোধ, জাতীয় সংস্কৃতিবোধ ও জাতীয় ধর্মবোধরূপে জাতীয় চেতনায় প্রাণবন্ত সবল রূপ পরিগ্রহ করছিল। বিবেকানন্দ নবজাগরণের বিচিত্র ভাবনারই মধ্য দিয়ে এসে এই নবজাগ্রত জাতীয় চেতনার প্রধান উদ্গাতা রূপে সেই ধর্ম ও সমাজ সংস্কার আন্দোলনের ক্ষেত্রে (ইং ১৮৯৩—১৯০০) দণ্ডায়মান হলেন—একেবারে যোদ্ধবেশে—ডাক দিলেন নবোদ্বুদ্ধ ভারতকে 'অভীঃ। বীর্যবান্ হও! তুমি অমৃতের সন্তান।' তাঁর প্রধান প্রেরণা এই স্বাজাত্যের প্রেরণা।

বিবেকানন্দের বাণীরূপ

এই বিবেকানন্দই মৃত্যুর পরেও ইং ১৯০৫ থেকে প্রায় ১৯৩০ পর্যন্ত বাঙলার ও ভারতের জীবনে জীবন্ত, নবজাগরণের বীর্যবান সাধক। স্বকাল ছাড়িয়ে তিনি এরূপে ভাবীকালের মধ্যে আত্মপ্রতিষ্ঠ হন কী প্রাণ-মন্ত্রের উদ্গাতা-রূপে তা আমরা দেখলাম। তাঁর মধ্যে সেই ত্রিধারার সংযোগ যথেষ্ট না থাকলে তা সম্ভব হত না, এইটুকুও সেই সঙ্গে বুঝবার।

নবজাগরণের সেদিনে (ইং ১৮৭৫-১৯০০) সাহিত্যক্ষেত্রে বিবেকানন্দ পদার্পণ করেন নি। কিন্তু তাঁর চিত্ত যে রসসম্পদে ঐশ্বর্যবান্ ছিল তা তাঁর যে কোনো লেখা ও যে কোনো বক্তৃতা পড়লেই অনুভব করা যায়। আরও বেশি অনুভব করা যায় এ কথা—তিনি সাহিত্যশিল্পী, বাঙলা ভাষার উপর ছিল তাঁর অসামান্য ক্ষমতা। সঙ্গীতে শিল্পে সাহিত্যে বিবেকানন্দের অনুরাগের কথা অনেকেরই জানা আছে। কিন্তু বাঙলা ভাষার যে তিনি অসামান্য লেখক এ কথাটা অনেকেই বিস্মৃত হন। বিশেষ করে চলতি বাঙলায় এমন প্রাণবন্ত বলিষ্ঠ প্রকাশ আর কারও পক্ষে সম্ভব হয়েছে কিনা জানি না। সে যুগে 'য়ুরোপ যাত্রীর

ডায়েরি' ও জলধর সেনের 'হিমালয়' ছাড়া আর কোথাও এমন অকুণ্ঠিত কথিত ভাষার ব্যবহার মনে পড়ে না।

> বুদ্ধ থেকে চৈতন্য, রামকৃষ্ণ পর্যন্ত যাঁরা লোকহিতায় এসেছেন তাঁর সকলেই সাধারণ লোকের ভাষায় সাধারণকে শিক্ষা দিয়েছেন।…চলিত ভাষায় কি আর শিল্প নৈপুণ্য হয় না? স্বাভাবিক ভাষা ছেড়ে একটা অস্বাভাবিক ভাষা তৈরী করে কি হবে? যে ভাষায় ঘরে কথা কও, তাহাতেই ত সমস্ত পাণ্ডিত্য গবেষণা মনে মনে কর, তবে লেখবার বেলা ও কি একটা কিম্ভূতকিমাকার উপস্থিত কর? যে ভাষায় নিজের মনে দর্শনবিজ্ঞান চিন্তা কর, সে ভাষা কি দর্শনবিজ্ঞান লেখবার ভাষা নয়? যদি না হয় ত নিজের মনে এবং পাঁচজনে, ও-সকল তত্ত্ববিচার কেমন করে কর?…ইত্যাদি

বিবেকানন্দের মৃত্যুর প্রায় এক দশক পরে এই দাবি তুলেছিলেন স্বর্গীয় প্রমথ চৌধুরী, বার বৎসর পরে প্রকাশিত হয় 'সবুজপত্র'। যুক্তির দিক থেকে এ বিষয়ে এর চেয়ে নতুন ও বেশি সঙ্গত কথা তাঁরও জানা ছিল না! আর ভাষার দিক থেকে বলা যায় বিবেকানন্দের থেকে বলিষ্ঠ বাঙলায় আর কেউ লিখতে পারেন নি। 'পত্রাবলী', 'ভাববার কথা', 'পর্যটকের পত্র', প্রভৃতি মূল বাঙলা লেখায় চলতি বাঙলার যে স্বচ্ছন্দ বলিষ্ঠ রূপ দেখা যায় তা আর চলতি বাঙলা ফিরে পায় নি। ধরা যাক্ ওস্তাদী গানের কসরতির সম্বন্ধে বিবেকানন্দের কথা:

> গান হচ্ছে, কি কান্না হচ্ছে, কি ঝগড়া হচ্ছে—তার কি ভাব, কি উদ্দেশ্য, তা ভরত ঋষিও বুঝতে পারেন না। আবার সে গানের মধ্যে প্যাঁচের কি ধুম। সে কি আঁকাবাঁকা ডামাডোল, ছত্রিশ নাড়ীর টান চায় রে বাপ!

কিম্বা স্থাপত্য সম্বন্ধেই ধরা যাক্ তাঁর কথা যিনি নিবেদিতার গুরু:

> বাড়ীটার না আছে ভাব, না ভঙ্গী। থামগুলোকে কুঁদে কুঁদে সারা করে দিলে। গয়নাটা নাক ফুঁড়ে ফুঁড়ে ব্রহ্মরাক্ষসী সাজিয়ে দিলে, কিন্তু সে গয়নায় লতাপাতা চিত্র-বিচিত্রের কি ধুম!
>
> মনের অশান্তি, তার মানে কোনো কাজ নেই। গাঁয়ে গাঁয়ে যা, ঘরে ঘরে যা, লোকহিত, জগতের কল্যাণ কর। নিজে নরকে যাও, পরের মুক্তি হোক্, আমার মুক্তির বাপ নির্বংশ।

এ ভাষা গঙ্গার জল—কলের নয়, ক্লোরিন মিশ্রিতও নয়। কারণ,

> যেটা ভাবহীন, প্রাণহীন, সে ভাষা, সে শিল্প, সে সঙ্গীত কোনো কাজের নয়। এখন বুঝবে যে জাতীয় জীবনে যেমন-যেমন বল আসবে, তেমন-তেমন ভাষা শিল্প সঙ্গীত প্রভৃতি আপনা আপনি ভাবময় প্রাণপূর্ণ হয়ে দাঁড়াবে।

কিম্বা সেই সুবিদিত বজ্রগম্ভীর প্রার্থনা :

> "তোমরা উচ্চবর্ণেরা কি বেঁচে আছ ?…তোমরা শূন্যে বিলীন হও। আর নূতন ভারত বেরুক! বেরুক লাঙ্গল ধরে, চাষার কুটীর ভেদ করে, জেলে মালো মেথরের চুপড়ির মধ্য হতে।"…ইত্যাদি।

এ তো ভাষা নয়। এ জীবন্ত মানুষ—ভাষার এ পৌরুষ সেই পুরুষ-প্রবরের ব্যক্তিস্বরূপ থেকেই উদ্ভূত। The style is the man. তাই সাধু বা চল্‌তি যে রীতিতেই যখন তিনি কলম চালিয়েছেন তখনি তাতে ফুটেছে এই বজ্রনির্ঘোষ।

বিবেকানন্দের ধর্মসাধনা

এতখানি রসবোধ, শিল্পবোধ ও প্রকাশশক্তি সত্ত্বেও নরেন্দ্রনাথ যে কেন মধুসূদন-বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথের সতীর্থ হলেন না, এই খেদ বা বিস্ময়ও তাই সহজেই জন্মে। হয়তো তার মুখ্য কারণ এই যে রসপিপাসা অপেক্ষা সত্য-জিজ্ঞাসাতেই তাঁর রুচি ছিল বেশি। তাঁর প্রকৃতিতে ছিল পৌরুষের প্রাধান্য। তাই নবজাগরণের সাহিত্যোৎসবে তিনি যোগ দিলেন না, 'মানুষ-গড়ার ধর্মে' আত্মনিবেদন করলেন।

আর নবজাগরণের অন্য প্রকাশ—রাজনৈতিক প্রয়াস? 'পলিটিক্‌সে'র প্রতি ছিল স্বামী বিবেকানন্দের প্রবল বিরাগ। তার বিরুদ্ধে আপনার মত দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা করতে তিনি কুণ্ঠিত হন নি—"পলিটিক্‌স্ আমি ঘৃণা করি।…আমার পলিটিক্‌স ভগবান।" অতএব, নবজাগরণের নানাবিধ ভাবনা-কল্পনা বিবেকানন্দের বিচিত্র সত্তায় মিলিত হলেও নরেন্দ্রনাথ ধর্মসংস্কারেই পেয়েছিলেন প্রধানত আপনার সাধন-ক্ষেত্র। এমন কি, সেই ধর্ম-সাধনারই প্রয়োজনে যতটুকু সম্ভব স্বীকার করেছিলেন সমাজ সংস্কারেরও দায়িত্ব। এই বিশেষ ক্ষেত্রেই তিনি উত্তীর্ণ হলেন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সঙ্গলাভে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব কোনো মতবাদ প্রচার করেন নি, কাউকে দীক্ষা দান করেন নি,

বিবেকানন্দকেও না। একদিকে ভারতের চিরাগত ধর্মসাধনা সেই প্রায় 'নিরক্ষর' পূজারী ব্রাহ্মণের মধ্যে রূপায়িত হয়ে উঠেছিল। অন্যদিকে আশ্চর্য-রূপে আধুনিক যুগাদর্শ সেই মানবিকতা, সেই 'যত জীব তত শিব', 'যত মত তত পথ', ওই ভারতীয় ধর্ম প্রস্থান ও ভারতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে যায়। বিবেকানন্দ তাই তাঁরই সেই আলোকে একই কালে ভারত-ঐতিহ্য ও যুগাদর্শ লাভ করেন, আত্মাবিষ্কার করতে সমর্থ হলেন। নবজাগরণের এই বিশেষ সাধক নরেন্দ্রনাথকে এরূপে বিবেকানন্দে পরিণত করেন—যুগাদর্শকে ভারতীয় আধারে স্থাপন করে। বিবেকানন্দের আত্মবিকাশের পথে আর যা প্রয়োজন ছিল তা হলো এই ভারতীয় আধারের সঙ্গে নিবিড়তর ও ব্যাপকতর পরিচয় ও যুগের জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা। ভারতবর্ষের সেই করুণ মহান রূপকে তিনি চিনলেন শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনাবসানের পরে, ইং ১৮৮৭-১৮৯৩ পর্যন্ত কালে, ভারত পর্যটন করে। বিবেকানন্দের দ্বিতীয় গুরু যদি কেহ থাকেন তবে সে এই ভারতবর্ষের জনসাধারণ। কিন্তু আরও অভিজ্ঞতার প্রয়োজন ছিল—আরও উপলব্ধির—তৃতীয় এক গুরুর। জটিলতর বুর্জোয়া জীবনের সঙ্গে বাস্তব পরিচয়ে তা তিনি লাভ করলেন ইং ১৮৯৩ থেকে ইং ১৮৯৬ পর্যন্ত, এবং পরেও (ইং ১৮৯৯-ইং ১৯০০) আমেরিকা ও ইউরোপের জীবন্ত সমাজ দর্শন করে। স্বামী বিবেকানন্দের ধর্ম-সাধনার যেমন ভিত্তি শ্রীরামকৃষ্ণের দ্বারা রচিত—অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের সেই সাধনা তেমনি পূর্ণাঙ্গ ও নিজস্ব হয়ে উঠেছে তাঁর স্বদেশপ্রীতির জ্বলন্ত বিশ্বাসে ও লোকসেবার ও দরিদ্র-নারায়ণের ভাবনার বিকাশে; আর তাঁর সার্বজনীন মানবিকতার, আন্তর্জাতিক সৌভ্রাত্রবোধের এবং সর্বশেষে 'শূদ্র' বা শোষিত সাধারণের প্রতি মমতায় ও আস্থায়। শুধু অধ্যাত্ম সাধনায় বিবেকানন্দ হয়তো দ্বিতীয় রামকৃষ্ণ হতে পারতেন। ইং ১৮৯৯তে কাশ্মীরে বীরভবানীর মন্দিরের অভিজ্ঞতার পরে সেই অদ্বৈতবাদী সাধক সেই সিদ্ধিতেও গিয়ে পৌছেছিলেন, মনে করা যায়। ১৯০০ সালের কালিফোর্নিয়ার অবিস্মরণীয় দীর্ঘ ইংরেজী পত্রে সেই কথাই শুনতে পাই :

> আহা, কি স্থির প্রশান্তি। চিন্তাগুলো পর্যন্ত বোধ হচ্ছে যেন হৃদয়ের কোন এক দূর, অতিদূর অভ্যন্তর প্রদেশ থেকে মৃদু বাক্যালাপের মত ধীর অস্পষ্টভাবে আমার কাছে এসে পৌছচ্ছে। আঁর শান্তি, মধুর শান্তি, যেন যা কিছু দেখছি, শুন্‌ছি সকল ছেয়ে রয়েছে…

> আমার মনের এখনকার অবস্থা ঠিক সেইরূপ, কেবল শান্তি, শান্তি।···

বিবেকানন্দের অধ্যাত্মজীবনের এইটিই পরম স্তর। কিন্তু তা সত্ত্বেও যদি জলন্ত স্বদেশপ্রীতি, বিস্তৃত আন্তর্জাতিক অনুভূতি ও শোষিত মানবতার প্রতি প্রাণভরা মমতা, এই তিন ভাবনা তাঁর আধ্যাত্মিকতাকে পরিপোষণ না করত, তাহলে বিবেকানন্দ বিবেকানন্দ হতে পারতেন না—ভারতের অনেক 'মুক্ত পুরুষে'র মতো আর একজন মুক্তপুরুষ হয়ে থাকৃতেন।

বিবেকানন্দের বৈশিষ্ট্য

প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় অদ্বৈতবাদকেও বিবেকানন্দ এই তিন আদর্শের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলেই আপনার বিশেষ অধ্যাত্মপ্রস্থান রূপে গ্রহণ করেছিলেন ও প্রচার করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। না হলে শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনায় এমন কিছু ছিল না যাতে অদ্বৈতবাদ গ্রহণ অনিবার্য ছিল। বরং দ্বৈতবাদই তাতে বেশি গ্রাহ্য হবার কথা। আবার, শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন ও বেলুড়ে মঠ প্রতিষ্ঠাও কোনো মায়াবাদী সন্ন্যাসীর পক্ষে অপরিহার্য কর্ম নয়। তা অপরিহার্য হয় নবজাগরণে জাগ্রত বলেই এই মানবহিতব্রত সন্ন্যাসীর পক্ষে। আর সর্বশেষে, চিরসমাধির পূর্বেও এই অধ্যাত্মযোগী তাঁর প্রিয়তম শিষ্যা নিবেদিতাকেই বা কেন শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন ত্যাগ করে ভারতীয় বৈপ্লবিক সাধনায় আত্মনিবেদনের অনুমতি দিয়ে গেলেন? এ যুগের ধর্ম-সাধনায়, সমষ্টিগত মুক্তির সাধনাতেই ব্যক্তিরও মুক্তি-সাধনা বলে নয় কি?

এই সব কথা উত্থাপন করলে প্রশ্ন ওঠে—তবে কেন বিবেকানন্দ-পলিটিক্সের প্রতি বীতরাগ ছিলেন? তার জন্য বুঝতে হয়—'পলিটিক্স্' বলতে তিনি যা বুঝতেন, যা নিজের জীবনে স্বদেশে ও বিদেশে দেখেছিলেন, তা সত্যই তুচ্ছ পদার্থ। ইংলণ্ডে, আমেরিকায় 'পলিটিক্স্' বলতে তখন বোঝাত দল বেঁধে শাসনের নামে শোষণের খেলা, স্বদেশে ও বিদেশে লুণ্ঠনের ব্যবসা। তাতে স্বার্থ যতটা—অনর্থ অবশ্য আরও বেশি থাকে—কিন্তু মনুষ্যত্বের নামগন্ধও থাকে না। আর শৌর্যবীর্যের পুরুষার্থেরই বা সত্যকার প্রয়োজন তাতে কোথায়? ভারতবর্ষে পলিটিক্স্ তখন আরও তুচ্ছ—'আবেদন আর নিবেদনের থালা' বহনের কেরামতি, greater association of Indians in the administration of India. সেদিনের কংগ্রেসের বড় স্পর্ধা—বড় দাবি 'আরও চাকর

হতে দাও মা, মহারাণী'। দেশের ভাব ভাষা, সাধারণ মানুষ, কারও সঙ্গে তার সম্পর্ক নেই। এই পলিটিক্স যে কোনো সুস্থ, আত্মমর্যাদাসম্পন্ন মানুষের পক্ষেই অগ্রাহ্য। বীর কেশরী বিবেকানন্দ এই চাকরী-প্রত্যাশীদের রাজনীতিকে গ্রহণ করবেন, এ কথা চিন্তা করাও যায় না। সত্যই তাঁর পলিটিক্স্ ভগবান—এই অর্থে যে সে 'অদ্বৈতম্' 'আব্রাহ্মণ চণ্ডাল মানবতায় সমভাবে সমাসীন, মানুষ মাত্রই তাতে মনুষ্যত্বের মহান অধিকারের অখণ্ডনীয় উত্তরাধিকারী; বিচিত্রের মধ্যে অদ্বৈতরূপে তা বিশ্বমানবের ঐক্যসূত্র।

এ কথাও অবশ্য তিনি জানতেন—ক্যালিফোর্নিয়ায় ইং ১৯০০তে শেক্স্পীয়র ক্লাবের বক্তৃতায় যা তিনি বলেছেন—"ভারতবর্ষ ধর্মের দেশ, ভারতবর্ষে পলিটিক্সের কথা বলতে হলেও তোমাকে তা বলতে হবে ধর্মের ভাষায়।" বুঝতে পারা যায়—সেদিনের রাজনীতি কেন বিবেকানন্দকে কিছুমাত্র আকৃষ্ট না করে বরং সেরূপ অধ্যাত্মপ্রস্থানের দিকেই ঠেলে দিয়েছিল যেখানে তাঁর স্বাজাত্যাভিমান পেয়েছে স্বস্তি, তাঁর পৌরুষ পেয়েছে আত্মবিকাশের সার্থকতা; তাঁর মানবিকতা পেয়েছে কর্মযোগে সার্বজনীন মুক্তি-সাধনার মহৎব্রত!

এই কথার সত্যতা প্রমাণিত হয়ে গেল বিবেকানন্দের মৃত্যুর প্রায় পরক্ষণেই—ভারতীয় রাজনীতি যখন স্বদেশী যুগের অগ্নিমন্ত্রের দীক্ষা গ্রহণ করল। বিবেকানন্দ কী চাইতেন কী চাইতেন না, নিশ্চয়ই সে প্রশ্নের এক উত্তর একটি জলন্ত অগ্নিশিখা—ভগ্নী নিবেদিতা—অন্য উত্তর যেমন স্বামী বিবেকানন্দের প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মিশন।

বিবেকানন্দ ও বিপ্লবী আন্দোলন

তৃতীয় একটা উত্তরও আছে—বাঙলা দেশের ১৯০৫ থেকে প্রায় ১৯৩০-এর জীবন। এই পর্বটিকে সর্বাধিক উদ্বুদ্ধ করেছেন স্বামী বিবেকানন্দ—সর্বাধিক জাতির আশীর্বাদ লাভ করেছে তখন রামকৃষ্ণ মিশন। এখানে বলা নিষ্প্রয়োজন সেদিনের বিপ্লবী বাঙলার বিপ্লবীদের বিবেকানন্দের বীরবাণী সর্বাধিক প্রেরণা জুগিয়েছে। হাজার-হাজার বুকে জলেছে এই মন্ত্র—

> হে বীর সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে বল,—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই। বল মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই।

শুধু তাই নয়—হাজার-হাজার মানুষ মনে মনে মেনেছে এই সত্য :

> তোমরা (উচ্চ শ্রেণীরা) শূন্যে বিলীন হও। আর নূতন ভারত সেই স্থানে বের হোক। বের হোক লাঙ্গল ধরে, চাষার কুটির ভেদ করে জেলে মালো মুচি মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হতে। বের হোক্ মুদির দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে, বের হোক্ কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে, বের হোক্ ঝাড় জঙ্গল, পর্বত পাহাড় থেকে।…

সম্মুখে এই 'উত্তরাধিকারী ভারতের' স্বপ্ন নিয়ে সেদিনকার বাঙলা দেশ ঝাঁপিয়ে পড়েছিল লোকসেবায়। দুর্ভিক্ষে প্লাবনে রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীদের নেতৃত্বে এগিয়ে গিয়েছে প্রথম দিকে (১৯০৭—১৯২১), তারপর কংগ্রেস সংগঠনের মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক কর্মের পতাকা নিয়ে (১৯২১-এর পর থেকে)— বিদেশীয় শাসকশক্তিকে করে দিয়েছে ভারতীয় জীবনে অবান্তর, অনাবশ্যক। বিবেকানন্দের মিশন এভাবেই পূর্ণ থেকে পূর্ণতর হয়ে চলেছে শতাব্দীর সেই প্রথম দু তিন দশক জুড়ে।

তাই বাঙলার তৎকালীন গবর্নর লর্ড রোনাল্ড্‌শে দ্বিতীয় দশকে এক সভায় বাঙালী বিপ্লবীদের উল্লেখ করে বলতে বাধ্য হয়েছিলেন—বিবেকানন্দের বাণী বিপ্লবী দলকে প্রেরণা দেয় ; রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাধর্মে তাঁরা বাস্তব আশ্রয় লাভ করে। কথাটা চমকিত করে তোলে সেদিনের মিশনের কর্তৃপক্ষকে। যাঁদের আশ্রয় নিবেদিতার পর্যন্ত এই বিপ্লবী কর্মোৎসাহের জন্য ত্যাগ করা প্রয়োজন হয়েছিল স্বভাবতই তাঁদের প্রতি এটি রোনাল্ডশে'র অমূলক সন্দেহ। মিশনের কর্তৃপক্ষ তখনি তাই গবর্নরের নিকট আপত্তি জানান ; তাঁদের সে আপত্তি রোনাল্ড্‌শে সাহেবও মেনে নেন,—সত্যই মিশন রাজনীতি-সম্পর্কশূন্য প্রতিষ্ঠান। কিন্তু মহত্তর ন্যায়বোধ তেমনি অকুণ্ঠচিত্তেই স্বীকার করত—বাঙলার বিপ্লবী আন্দোলনের প্রাণমন্ত্র জোগাচ্ছিলেন মিশন না হোক্, স্বয়ং বিবেকানন্দ। বিপ্লবী সাধন-পদ্ধতির একটা বিশিষ্ট অঙ্গ ছিল বিবেকানন্দ প্রচারিত লোকসেবা ও গীতার নিষ্কাম কর্ম, লক্ষ্যও ছিল তাঁরই নির্দিষ্ট আব্রাহ্মণ-চণ্ডাল সকলের মুক্তি, সর্বজাতির মানুষের অধিকারে এ দেশের মানুষেরও প্রতিষ্ঠা। বিবেকানন্দের ভাষায় :

> "তাই আমরা চাই—কারও জন্য বিশেষ সুবিধা নয়, সকলের সমান সুযোগ। সকলকেই শেখাতে হবে ভগবান প্রত্যেকের মধ্যে আছেন

> আর প্রত্যেককেই তার নিজের পথে অর্জন করতে হবে তার মুক্তি।"

তখনো বিবেকানন্দের অন্য স্পষ্ট ঘোষণা ছিল প্রায় সযত্নে সংগোপিত : "I am a socialist" তবু শোনা গিয়েছিল বিবেকানন্দের সেই উক্তি—ব্রাহ্মণের যুগ, ক্ষত্রিয়ের যুগ গিয়েছে, বৈশ্যের যুগ এখন চলছে ; এবার আসছে শূদ্রের যুগ—পশ্চিমে তার প্রথম আভাস দেখা দিয়েছে। "সোশ্যালিজম্‌, এনার্কিজম্‌, নিহিলিজম্‌ প্রভৃতি মতবাদের পথিকরা হচ্ছে আগতপ্রায় সেই সমাজ বিপর্যয়ের অগ্রদূত।" অর্থাৎ দরিদ্রনারায়ণের সেবা শেষ কথা নয়—চাই দারিদ্র্যের অবসান, শোষণের বিলোপ, শোষিতের মুক্তি। এই 'আগত-প্রায় সমাজ-বিপ্লব'ও ইং ১৯১৭ সালেই এসে গেল। আর, ১৯৩০ সাল থেকে বলা যায় বিবেকান্দের পরিদৃষ্ট সেই সম্ভাবনা ভারতবর্ষেও বাস্তব আকার লাভ করতে লাগল শুধু কারান্তরিত বিপ্লবীদের বুকে নয়, 'হুইদার ইণ্ডিয়ার' অশান্ত প্রচারক জওহরলালের মুখেও। সুভাষচন্দ্র খেদোক্তি করছিলেন 'মঠ' ও 'মিশন'কে সেখানে না পেয়ে।

ইতিহাসের বিচার

একথা পরিষ্কার করেই বুঝা দরকার—১৯১৭-এর অক্টোবর বিপ্লবীদের 'সোশ্যালিজম্‌' ও বিবেকানন্দের 'সোশ্যালিজম্‌' বা শূদ্রের শাসন এক জিনিস নয়—জওহরলালের 'সোশ্যালিজম্‌'ও নয়। বিবেকানন্দ অধ্যাত্মবাদী, অদ্বৈতবাদী —এবং 'জড়বাদের' ঘোরতর শত্রু। বুর্জোয়া সভ্যতায় পাশ্চাত্ত্য দেশের অগ্রগামী বুর্জোয়া ভাবনা ও প্রয়াস সমূহে তিনি আকৃষ্ট হয়েছিলেন—ব্যক্তিজীবনে তার বাস্তব দান ও সমাজ-জীবনে শ্রেষ্ঠ মূল্য সমূহ রূপায়িত করতে। মিশনের কাজেও সেই সংগঠন-পদ্ধতি গ্রহণ করতে কিছুমাত্র অবহেলা বিবেকানন্দ করেন নি। কিন্তু কিছুমাত্র তাঁকে আকর্ষণ করে নি বুর্জোয়াদের মেটিরিয়ালিজম্‌, তার ভোগবাদ। বরং এই ভোগবাদের উপর তিনি দৃপ্ত যোদ্ধার মতোই ভারতের ত্যাগবাদী আদর্শকে জয়ী করতে চেয়েছেন। এ হিসাবেই তিনি মায়াবাদের সমর্থক—এই বিলাস-বর্বরতা ও ভোগরাশির মধ্যে সত্য কোথায় ? যারা এই ভোগের আদর্শ গ্রহণ করেছে তারাই মরেছে, জীবিত আছে বরং মায়াবাদী আদর্শের ত্যাগব্রতীরা।

> "তারা (অপরেরা) যতদূর সাধ্য ভোগ করিয়াছে, কিন্তু পরমুহূর্তেই

দেখিতেছি সবই মায়া। মহামায়ার সন্তানেরা চিরকাল বাঁচিয়া থাকে,
কিন্তু অবিদ্যার সন্তানগণের পরমায়ু অতি অল্প।"

একথা এ প্রসঙ্গে বলা নিষ্প্রয়োজন যে, 'অবিদ্যার' দ্বারা যে বুর্জোয়া সভ্যতা বা সোশ্যালিস্ট সভ্যতা মৃত্যু উত্তীর্ণ হতে চায় তা 'জড়বাদী' নয়; বস্তুবাদী বা 'মেটিরিয়ালিস্ট', জীবনধর্মী—অলৌকিকে বা অপ্রাকৃতে আস্থাহীন। মানবতায়, প্রীতিতে, মমতায় ও শিল্পে, বিজ্ঞানে সৃজনপ্রয়াসে তারা মানুষের 'অধ্যাত্মবোধকে' একটা বাস্তব (objective) সার্থকতা দিচ্ছে—ভাবময় (subjective) ধ্যানই অধ্যাত্মবোধের পক্ষে পর্যাপ্ত নয়। নিঃসন্দেহে আধুনিক বস্তুবাদ ভোগকে প্রাণের প্রাথমিক প্রয়োজন বলে স্বীকার করে। কিন্তু ভোগসর্বস্ব মেটিরিয়ালিজম্ হচ্ছে ভালগার মেটিরিয়ালিজম্। ভোগের প্রাধান্য যদি সোশ্যালিষ্ট সমাজে মননের ও আত্মিক সৃষ্টির প্রয়াসকে আচ্ছন্ন করে,—সেই সমাজেও রোমসাম্রাজ্যের মতো যদি 'রুটি ও সার্কাসের' প্রবৃত্তিই জয়ী হয়,—তা হলে অবিদ্যার এই সন্তানগণের পরিণামও মৃত্যুই—সে কথা মিথ্যা নয়।

কিন্তু এ প্রসঙ্গে এই কথাটা বুঝা আরও প্রয়োজন—স্বামী বিবেকানন্দ ভারতবর্ষের ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে গিয়ে 'মায়াবাদ' ও 'অধ্যাত্মবাদ'কে যে ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন তাতে তার অপব্যাখ্যা সহজতর। এ দেশ ত্যাগের দেশ, এ কথাটা অর্ধসত্য। কারণ বিবেকানন্দই বলতেন যার কিছু নেই সে আবার ত্যাগ করবে কি? তথাপি বিবেকানন্দ ঐতিহ্য-সম্মত সনাতনী রীতিনীতি ও ভাষা ব্যবহার করাতে তাঁরই অপব্যাখ্যায় অবতারবাদ, গুরুবাদ ও নানা রূপ অলৌকিক কাহিনী (myth) ও যুক্তিহীনতা এখন জোর পেয়েছে।

লিবারল সংস্কারবাদীদের সাহেবী-অনুকরণকে নিরস্ত করে তিনি স্বাজাত্যাভিমানের বশে নবজাগরণের মধ্যে যে শক্তিসঞ্চার করেছিলেন, তাতেও অবিদ্যার প্রশ্রয় অসম্ভব নয়। পুরাতন পূজাপদ্ধতি, রীতিনীতি, এবং তার সঙ্গে একটা উপরতলার অধ্যাত্মবিলাসে বিবেকানন্দের 'দরিদ্র নারায়ণ ও সোশ্যালিজম্' এই 'মহামায়ার সন্তানদের' নিকট সন্দেহজনক, অবহেলিত ও পরিহার্য হয়ে উঠছে। তারাও বাঁচবে না যারা অধ্যাত্মবাদের ভাবসর্বস্বতাকেই (subjectivism) মনে করে যথেষ্ট. শোষণকেও মেনে নেয়—মহামায়ার মায়া।

এই জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে আজ যখন বিবেকানন্দকে আমরা স্মরণ করি তখন ন্যায়সঙ্গত ভাবেই তাঁর সন্ন্যাসী সম্প্রদায় তাঁকে স্মরণ করবেন

প্রধানত অধ্যাত্মবাদী সাধকরূপে। তাঁদের সেই দৃষ্টি যে মিথ্যা নয় তা আমরা পূর্বেই মেনে নিয়েছি। সেই সঙ্গে নিষ্কাম কর্ম ও দরিদ্র নারায়ণকেও তাঁরা কিছু মূল্য দিবেন আশা করি, না হলে সেই কথাই সত্য হবে—খ্রীষ্টের স্থান নেই চার্চে, বিবেকানন্দেরও স্থান নেই মঠে-মিশনে। কারণ যে বিবেকানন্দ স্বদেশ-প্রেমিক—ভারতবাসীকে আত্মমর্যাদাবোধে প্রবুদ্ধ করেছেন, আত্মপ্রতিষ্ঠার সাহস জুগিয়েছেন—যে বিবেকানন্দ দেশের একটি কুকুরও অভুক্ত থাকতে নিজে অন্নগ্রহণ করাকে মনে করেছেন অন্যায়, যে বিবেকানন্দ যুগগতির দ্রষ্টারূপে ঘোষণা করছেন "আমি সমাজতন্ত্রী" আর যে বিবেকানন্দ স্বজাতির মুক্তির ও মানুষের সর্বজাতিক ঐক্যের দৃঢ় প্রবক্তা—দেশের ও বিদেশের জনসাধারণের কাছে তিনিই পরম আত্মীয়, তিনিই ইতিহাসের মধ্যে জীবন্ত বিবেকানন্দ। অবশ্য আমরা সর্বদেশের সাধারণ মানুষরা তাঁকেই বিশেষ করে যখন স্মরণ করব সেই সঙ্গে যেন মনে রাখি—মেটিরিয়ালিজম্ সম্বন্ধে তাঁর সংশয় ও বিরাগের কারণ। মেটিরিয়ালিজম্ জড়বাদ নয়, ভোগবাদ নয়; তা মানবধর্ম, মানবিকতার বাস্তব সাধনা। ইতিহাসের এই সত্যকে অনুভব করাও এই ঐতিহাসিক পুরুষের স্মৃতিপূজার সময়ে কম প্রয়োজন নয়॥

পু স্ত ক প রি চ য়

The Reivers—William Faulkner. Chatto and Windus. 18s.

প্রথম প্রকাশ, সেপ্টেম্বর, ১৯৬২

"আমার শেষ বই হবে ইয়োক্‌নাপাটোফা জেলার ডুম্‌সডে বুক্, গোল্ডেন বুক্। তারপর পেন্সিল ভেঙে আমি ক্ষান্ত হব।" ফক্‌নর বলেছিলেন, পারী রিভিউ-এর প্রতিনিধি জীন্ স্টাইন্‌কে। ফক্‌নর এই শেষতম কীর্তিতে কি সেই প্রতিশ্রুতি রাখলেন? "দি রিভার্স" পড়তে পড়তে মনে হয়েছে, ইয়োক্‌নাপাটোফা জেলার উপাখ্যান যেন এতদিনে সম্পূর্ণ হল: চাকা পুরো ঘুরে এসেছে। এবং ঐ সম্পূর্ণতার আভাস দেবার অভিলাষেই বোধ হয় ফক্‌নর তাঁর সাবেকী সুর ও মেজাজ বদলে ফেলেছেন: ফক্‌নরকে প্রায় অচেনা লাগে। ডুম বা ফেট্যালিটির ছায়াও এবার সরে গেছে।

ইয়োক্‌নাপাটোফা নামে যে অ্যাপোক্রাইফাল প্রদেশটি ফক্‌নর সৃষ্টি করেছেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দাক্ষিণাত্য প্রদেশের ঐতিহাসিক সমাজস্বরূপই তার ভিত্তি। এই দক্ষিণাঞ্চলই গৃহযুদ্ধে দাসত্বপ্রথা, বর্ণবিদ্বেষ ও তৎসন্নিহিত তাবৎ রক্ষণশীল ভাবধারার সপক্ষে অস্ত্রধারণ করেছিল। পরাজয়ে তার মনোভাব রাতারাতি বদলে যায়নি, বরং ক্ষোভ চাপা আক্রোশ হয়ে বেঁচে থেকেছে। ব্যর্থতার ক্ষোভের এই ভিত্তিতেই দক্ষিণী মনের মনস্তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা। বংশগৌরব ও রক্তের সম্পর্ক স্বভাবতই ফিউডাল চিন্তাধারার অবশেষরূপে রয়ে গেছে। এ অঞ্চলে মাথামাথি বা রেশারেশি, সবই ঐ কটি পুরনো পরিবারের মধ্যে—সার্টোরিস্, স্টীভেন্‌স্, কম্পসন্, ম্যাক্যাসলিন্, সাটপেন্, কোল্ড্‌ফিল্ড্। অদ্ভুত অতিতাশ্রয়ী অবাস্তব এই মনস্তত্ত্বের চাপে পারিপার্শ্বিকের পরিবর্তনের সঙ্গে নিজেদের মেলাতে না পেরে, সমাজের দিকে খোলা চোখে তাকাবার সাহস না পেয়ে এরা অসুস্থ মনোবিকারে জ্বলে মরে। মন যতই সঙ্কীর্ণ হয়, ততই একরোখা হয়। সংস্কারের গণ্ডিতে এরা আবদ্ধ থাকে, বাইরের আলো-হাওয়ার আস্বাদ পায় না; আর, ক্ষুদ্র স্বার্থ, বাধকোচিত অভিমান, কখনও বা কোনো তুচ্ছ আকাঙ্ক্ষা জীবনের নিয়ামক হয়ে দাঁড়ায়। জেসন কম্পসন্ বিদ্রোহিণী ভগিনী ক্যাণ্ডেস্-এর ওপর শোধ তোলে, বেয়ার্ড

সার্টোরিস্ নতুন মোটরগাড়ির গতির নেশায় পাগল হয়, কোয়েন্টিন কম্পসন্ বংশের শুদ্ধতাহানির সাক্ষাতে আত্মঘাতী হয়। ফক্‌নর যে প্রায়ই ভিন্ন চরিত্রে একই নাম ব্যবহার করেন, তারও তাৎপর্য অনুমেয়—একই রক্ত, একই চেতনা বংশানুক্রমে যাদের মধ্যে প্রবাহিত, তাদের নামমাত্রে কী আসে যায়?

ফক্‌নরের উপন্যাসে এতদিন এই শ্রেণীর পাশেই ঈষদূন গুরুত্বপূর্ণ আসন পেয়েছে নিগ্রো পরিচারক-পরিচারিকা শ্রেণী এবং দরিদ্র শ্বেতাঙ্গ বা মিশ্রবর্ণ সমাজ। 'দি সাউণ্ড অ্যাণ্ড দি ফিউরি' উপন্যাসে নিগ্রো পরিচারিকা ডিল্‌সি তীব্র সংঘর্ষের মুহূর্তেও ক্যাণ্ডেস্ কন্যা কোয়েন্টিনের সপক্ষে দাঁড়ায়, শক্তিমান প্রভু জেসন্‌কে বাধা দেবার সাহস রাখে। ফক্‌নর নিজেই বলেন, "ডিল্‌সি আমার প্রিয় চরিত্রগুলির মধ্যে একজন। কেননা, সে বীর, সাহসী, উদার, কোমল, সৎ—আমার চেয়ে ঢের বেশি সাহসী, সৎ ও উদার।" 'রিকোয়াএম্ ফর্ এ নান্'-এ নিজের জীবন দিয়ে পরিচারিকা ন্যান্‌সি শ্বেতাঙ্গ পরিবারের ভাঙন রোধ করে। সুস্থ প্রাণোচ্ছল চেতনার ধারক এই সমাজ ফক্‌নরের নতুন উপন্যাসের পুরোভাগে এসে দাঁড়িয়েছে!

এবারেও দুই শ্রেণী তাদের স্বকীয় চিন্তাধারা নিয়ে উপস্থিত। কর্নেল সার্টোরিসের হুকুমে শহরে মোটরগাড়ির চলাচল নিষিদ্ধ হল বলেই প্রতিদ্বন্দ্বী প্রীস্ট পরিবার (ফক্‌নর ইয়োক্‌নাপাটোফা প্রদেশের সনাতনী 'হায়রার্কি' ভাঙবেন না, তাই প্রীস্ট পরিবারকে ম্যাক্যাস্‌লিন ও এড্‌মণ্ড্‌স্ পরিবারের শাখা বলে প্রতিষ্ঠা করতে তাঁর ভুল হয় নি, কম্পসন্ পরিবারের সঙ্গে প্রীস্ট পরিবারের সম্পর্কও তিনি উল্লেখ করেছেন) নতুন মোটরগাড়ি কিনে নিজেদের জোর ও মর্যাদার প্রমাণ দিলেন (ব্যাপারটা যেন স্তর অ্যাণ্ড্রু অ্যাগিউচীকের ঝগড়া বাধাবার মতো), কিন্তু এ উপন্যাসের মুখ্য চরিত্র হয়ে উঠেছে নিগ্রো পিতামহী ও হুইস্কী-ব্যবসায়ী স্বল্পবিত্ত পিতামহের উত্তরসূরী (অন্য উপন্যাসে এই শ্রেণীই 'হোয়াইট্ ট্র্যাশ' নামে সনাতনীদের ঘৃণা ও বিদ্বেষের পাত্র), নিগ্রো নেড্, এবং সাবেকী কুলের তরুণতম প্রতিনিধি এগারো বছর বয়স্ক লুসিয়াস্ প্রীস্ট। পরিবারের বয়স্কজনদের অনুপস্থিতির সুযোগে এরা গাড়ি চুরি করে লম্বা পাড়িতে বেরিয়ে পড়ে। এদের শখ নিতান্তই সরল ও সহজ—জীবনকে চেখে দেখবে, আনন্দের ভাগ আদায় করে নেবে।

এই ত্রয়ী যাত্রা দেখে বোঝা যায়, কুলগর্বীদের জীবনে কত বড় একটা ফাঁক থেকে গেছে। এরা তিনজনে কাদা পার হয়, নদী পার হয়, ঘুষোতে

পায় না, জেলে যায়—জীবনে এতরকম অভিজ্ঞতা। গণিকালয়, ঘোড়দৌড়ের মাঠ—সর্বত্রই এদের অবারিত গতি। জীবন ও অভিজ্ঞতার এই বৈচিত্র্য থেকেই কুলগর্বীদের সমাজ বঞ্চিত থেকে গেছে। ফক্‌নরের পূর্বতন উপন্যাসগুলিতে লক্ষ্যণীয়, এত পথ ও এত যাতায়াত এরা কখনও দেখেনি, পায়নি। জীবনের বৃহত্তর উদারতর ধারার সঙ্গে নিবিড় যোগেই 'হোয়াইট্ ট্র্যাশ' ও নিগ্রোদের প্রাণশক্তি, তাদের জীবনের দামও তাই বেশি।

"দি রিভার্স"-এ মেম্‌ফিসের গণিকালয় অন্যতম ঘটনাক্ষেত্র। হাল্‌কা চালের বর্ণনায় এই গণিকালয়ের যে-চরিত্র ফুটে ওঠে, তাতে কোনো নৈতিক প্রশ্ন উঠতেই পারে না ; এ যেন কোনো নিষ্পাপ বোর্ডিং হাউস্। স্টাইনবেকের 'ক্যানারি রো'-র প্যালেস্ ফ্লপ্ হাউস্ প্রায় একই জাতীয় গণিকালয়। উভয়ত্রই অধিবাসিনীরা সুস্থ শান্ত নারীমাত্র—বাইরের অগণিত নারীকুলের সঙ্গে এদের তো কোনোই তফাৎ চোখে পড়ে না। এদের নৈশজীবন সম্পর্কে স্টাইনবেক বা ফক্‌নরের যেন কোনোই কৌতূহল নেই। দায়দায়িত্বহীন জীবনানুরাগে ওদিকে ম্যাক্ ও তার দল, এবং এদিকে বূন ও লেড্ সগোত্র। গণিকাদের সঙ্গে এদের সম্পর্ক সহজ সুস্থ বন্ধুত্বের, অনেকটা হয়তো সহকর্মীর। বূন ও লেড্, ম্যাক ও তার দল আনন্দের কোনো কর্মে অন্ন জুটিয়ে নিয়ে বাঁচতে চেয়েছে। ডোরা কিংবা রেবাও তো তা-ই চেয়েছে, শুধু পথেই যা কিছু প্রভেদ, পথও তো জন্মপ্রকৃতিগত। কোনো পক্ষেই লজ্জাশরম, ক্ষোভ, পাপপুণ্য ইত্যাদি নৈতিক প্রশ্ন, অথবা কোনো ইতরতা নেই। 'সুইট্ থার্সডে' উপন্যাসে স্টাইনবেক অবশ্য সুজি-র মধ্যে নিজ পেশা সম্পর্কে লজ্জাবোধ এনেছেন। ডক-কে ভালাবেসে সুজি ডক-এর যোগ্য হয়ে উঠবে বলে নিজের জীবনকে বদলে দিয়েছে, বয়লারের মধ্যে বাসা বেঁধে গৃহস্থালি পেতেছে।

সুজির এই পরিবর্তনের পশ্চাতে স্টাইনবেক যে পটভূমি রচনা করেছেন, করি-র অনুরূপ পরিবর্তনের পশ্চাতে ফক্‌নর আরো তাৎপর্যপূর্ণ, আরো মানবিক এক পটভূমি রচনা করেছেন। করি তার ভাগিনেয় অটিস্‌কে শহুরে ভদ্রতা ও আদবকায়দায় তালিম দেবে বলে নিজের কাছে এনে রাখে। লুসিয়াস্‌কে দেখে করি তার কল্পনার আদর্শ উপলব্ধি করে। কিন্তু স্বার্থপর অটিস্ বদলায় না, বরং রাত্রে লুসিয়াসের কাছে গল্প করে, আণ্ট্ ফিটি-র গণিকালয়ে করির ঘরের গায়ে ছিদ্র করে অভ্যাগতদের উঁকি মেরে দেখবার সুযোগ করে দিত, পরিবর্তে প্রত্যেকের কাছ থেকে একটি নিকেল আদায় করত। লুসিয়াস্

এই গল্প শুনে হঠাৎ অটিস্‌কে মারতে শুরু করে, পরে অটিসের ছুরিতে সামান্য আহত হয়। করি এসে পড়ে ; লুসিয়াস বিবাদের কারণ প্রকাশ করে না। করি অটিসের কাছ থেকেই ব্যাপারটা জেনে নেয়, লুসিয়াসকে এসে বলে : "তুমি আমার জন্যে লড়াই করেছ। আগে তো লোকে—মাতালের দল—আমাকে নিয়ে লড়াই করেছে। তুমিই প্রথম আমার জন্যে লড়াই করলে। দেখো, আমি এ কখনো দেখি নি, আমি এতে অভ্যস্ত নই। আমি কী করব, তাই বুঝতে পারছি না। একটা কাজ আছে, আমি করতে পারি। আমি তোমার কাছে একটা প্রতিজ্ঞা করব। আরকান্‌সাসে আমিই দোষ করেছিলাম। কিন্তু সে দোষ আমি আর রাখব না।" লুসিয়াস বলে, "তাহলে দোষটা তোমার নয় ?" করি বলে, "আমারই দোষ। আমি তো বাছতে পারতাম। আমি তো সিদ্ধান্ত নিতে পারতাম। আমি তো চাকরি খুঁজে নিতে পারতাম। কিন্তু আর আমার দোষ রাখব না। তোমার কাছে প্রতিজ্ঞা করছি।" গণিকাজীবনের গ্লানি ভুলে থাকবার চেষ্টায় যখন আমরাই করি-রেবা-মিলির অভিনয়কেই সত্য মেনে নিতে বসেছিলাম, তখনই এই নতুন আভাস আমাদের ধারণাকে ভেঙে দেয়। এবং আমাদের ধারণা যখন এই আঘাত পায়, তখনই ফক্‌নরের সতর্কবাণী মেনে নিতে হয় : "দেখছ ? খুব দ্রুত শিখে চলতে হয়। অন্ধকারে লাফ দিতে হয়, এই ভরসায় যে, কেউ, কিছু, কারা তোমার পা ঠিক জায়গাতেই নামিয়ে দেবে।" তবু যদি কেউ বলেন যে, গ্লানির আর তো কোনো ইঙ্গিত নেই, তখন পাঠককে স্মরণ করিয়ে দিতে হয় যে, সমগ্র চিত্রটিই লেড্, বূন, ও লুসিয়াসের চোখে দেখা।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, ফক্‌নরের উপন্যাস তাঁর মনে প্রায়ই জন্ম নেয় কল্পিত বা দৃষ্ট কোনো চিত্র বা কল্পিত কোনো বিশেষ পরিস্থিতি থেকে। 'দি সাউণ্ড্ অ্যাণ্ড্ দি ফিউরি' শুরু হয়েছিল এইভাবেই—পিয়ার গাছের ডালে একটি ছোট্ট মেয়ে বসে আছে, তার জাঙিয়ার পিছনে কাদা লেপ্টে রয়েছে, তার ঠাকুমার শোকযাত্রা দেখে তার ভাইদের (নিচে দাঁড়িয়ে আছে) বিবরণী শোনাচ্ছে, এই চিত্র থেকে। 'দি রীভার্স'-এরও অনুরূপ উৎস কল্পনা করা যায়। 'পারী রিভিউ'*-এর প্রতিনিধি ফক্‌নরকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "লেখকের পক্ষে সেরা পরিবেশ কী ?" ফক্‌নর বলেছিলেন, "আমার কথা যদি বলেন, আমি সেরা যে কাজের প্রস্তাব পেয়েছিলাম, সেটা ছিল গণিকালয়ের বাড়িওয়ার কাজ। আমার মতে, লেখকের কাজ করার পক্ষে এটাই যথার্থ পরিবেশ।

এতে লেখক পরিপূর্ণ অর্থনৈতিক স্বাধীনতা পায়, ভয় ও ক্ষুধা থেকে মুক্তি পায়, মাথার ওপরে ছাদ থাকে। সামান্য কিছু হিসেবপত্র রাখা আর মাসান্তে একবার পুলিশের পাওনা মিটিয়ে আসা ছাড়া আর কোনো কাজ থাকে না। সকালে জায়গাটা শান্ত থাকে, আর সকালটাই লেখার পক্ষে দিনের মধ্যে সেরা সময়। একঘেয়েমির ভয় থাকলে সন্ধের সামাজিক জীবনে যোগ দিলেই চলে। এতে সমাজে তার প্রতিষ্ঠাও থাকে; ম্যাডাম নিজেই খাতাপত্র রাখেন, তাই লেখকের কোনোই কাজ থাকে না। বাড়ির সকলেই মহিলা, সকলেই লেখককে 'স্যার' বলে সম্বোধন করে, পাড়ার যত বেআইনী মদের কারবারী, 'স্যর' বলে। আর, লেখক নিজে পুলিশের লোকদের প্রথম নাম ধরে ডাকতে পারেন।" এই চিত্র থেকেই, অর্থাৎ মিস্টার বিন্‌ফোর্ডের চরিত্র থেকেই কি 'দি রীভার্স'-এর সূচনা?

প্রীস্ট্-এর সাধের গাড়িটি দান করে লেড্ তার পরিবর্তে একটি ঘোড়া নিয়ে আসে। ঘোড়দৌড়ে প্রতিবার হেরেছে যে ঘোড়া, সেই ঘোড়াটাকে জিতিয়ে দেবার ভরসা লেড্ রাখে। ঘোড়া দু' দুবার জিতেও যায়। এই প্রসঙ্গে রেমার্কের উপন্যাসে কার্ল নামে সেই আপাতজীর্ণ গাড়িটির কথাও এসে পড়ে। জীবনে যারা নিজেরা যোগ্য স্বীকৃতি পায় না, তারা নিজেদেরই মতো অবহেলিত বা অবজ্ঞাত কিছুকে ছলে বা বলে জিতিয়ে দিয়ে প্রকারান্তরে যেন এই কথাই ঘোষণা করে যে, তাদের বাতিল বলে চালাবার যতই চেষ্টা চলুক না কেন, তারাও জিতবার মুরোদ রাখে। 'থ্রি কম্‌রেড্‌স্'-এর লেনৎজ্ তাই বলে যে, "কার্ল-এর একটা শিক্ষামূলক মূল্য আছে; সে লোককে এই শিক্ষাই দেয় যে, বাইরের রূপে যতই ভুল বোঝবার সম্ভাবনা থাক, মানুষের মধ্যে যে সৃষ্টির ক্ষমতা আছে, তাকে সম্মান জানাতে হয়।"

অভিজ্ঞতার প্রসার ও দৃষ্টির উন্মোচন—এরই মধ্যে দক্ষিণী সনাতনী কুলের বাঁচবার আশা। বূন্ ও লেড্ অন্যতর শ্রেণীর দৃষ্টি নিয়ে এসে লুসিয়াস প্রীস্টকে সেই চোখ দিয়ে দেখবার শিক্ষা দিয়েছে, তার সামনে পৃথিবীর পথ খুলে দিয়েছে, বৃহত্তর সমাজের লোকযাত্রার স্রোতের মধ্যে তাকে এনে দিয়েছে। লেড্ ও বূনের অপরাধ সেই কারণেই মাপ হয়ে যায়।

গণিকাকুল যেদিন থেকে সাহিত্যে স্থান পেয়েছে, সেদিন থেকেই তারা হয় করুণা, নয় বিদ্বেষের পাত্রী হয়ে থেকেছে। ফ্রয়েডের আবির্ভাবের পর তারা মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণে এক বিশিষ্ট টাইপ্ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফ্রয়েডীয় তত্ত্বের

জাল ছিঁড়ে বেরিয়ে আসবার চেষ্টায় নেমেই পশ্চিমী সাহিত্যিকেরা গণিকাদের দেখেছেন, সাধারণ সাধ-আহ্লাদ রাগ-ভালবাসায় গড়া সাধারণ মানবী হিসেবে, কোনো বিশেষ শ্রেণী হিসেবে নয়। স্টাইনবেক, রেমার্ক, গ্রাহাম গ্রীন প্রভৃতির এই ধারায় এবার ফক্‌নরও যোগ দিয়েছেন (বহু বিশিষ্ট পশ্চিমী সাহিত্যিকের মতই ফক্‌নর-ও ফ্রয়েড্‌কে বিশেষ কোনো মূল্য দিতে নারাজ)।

উপন্যাসের কলা-পরিকল্পনায় ফক্‌নর তাঁর বহুধাচালিত পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষতম উপন্যাস অবধিই চালিয়ে গেছেন। এখন বৃদ্ধ পিতামহ লুসিয়াস প্রীস্টের জবানীতেই তাঁর বালকবয়সের কাহিনী শোনা যায়। অভিজ্ঞতার প্রারম্ভে যা অস্পষ্ট ও অভিনব ছিল, এতদিনে তা স্পষ্ট ও পুরাতন হয়েছে। বৃদ্ধ লুসিয়াস সেই অতীতের অনুভূতিগুলিকে পুনরায় তুলে ধরবার চেষ্টা করায় প্রাজ্ঞজন ও শিশুর দৃষ্টির সমাহারে ফক্‌নর 'অব্‌জেক্‌টিভিটি'-র এক বিশেষ রূপ রচনা করেন। কথার মধ্যে মধ্যে ব্যাখ্যানমূলক দু' একটি পুনরুক্তিতে বৃদ্ধজনের বিশেষ স্বর ধরা পড়ে; অথচ কথার গতিতে, কখনও দুর্লভ প্রকৃতি বর্ণনায় প্রথম মুক্তির উচ্ছল আনন্দও ধরা পড়ে। দ্বিস্তর দৃষ্টির সতর্ক ব্যবহারে ফক্‌নর রচনাকৌশলের কারিগরিতে তাঁর পুরনো সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখে গেছেন।

শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়

জাপানী কবিতা॥ অসিত সরকার। কারেন্ট বুক এজেন্সী। দু টাকা॥

অনুবাদ, বলাই বাহুল্য, দুরূহ কর্ম। এবং প্রয়োজনীয়। বিশেষত বাংলা দেশে যথেষ্ট যথার্থ অনুবাদ-সাহিত্যের ব্যাপকচর্চা সমবেতভাবে শুরু হওয়া উচিত। কারণ, একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে এ দেশে বৃহত্তর পাঠকসমাজের রুচি নিম্নমুখী—এর কারণ পাঠক সাধারণ নন নিশ্চয়ই, নানা সামাজিক ফাঁকিই এর মূলে। উনবিংশ শতাব্দী থেকেই আমাদের রাষ্ট্রচিন্তায় যে দুঃসহ ভ্রান্তি চলে আসছে, (আমাদের পূর্বসূরীদের প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা নিয়েই বলা চলে) সেটাই এর অন্যতম কারণ—অবশ্যই এক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথ মহৎ ব্যতিক্রম। তাই সুরুচি ও সাহিত্যবোধকে সমাজে চারিয়ে দিতে হলে, স্বাভাবিক কারণেই বিদেশী সাহিত্যের অনুবাদ, স্বদেশী সাহিত্যকে সৎ করার সঙ্গে সঙ্গেই প্রয়োজন। সে কারণে, সৎ অনুবাদ-প্রচেষ্টামাত্রই—এখনও অবধি যা ব্যক্তিগত—অভিনন্দনীয়।

কোনো লেখক বা কবির রচনা পড়া, ভালো লাগা, তাতে মুগ্ধ হওয়া এক কথা,—তাকে অনুবাদ করে সর্বসাধারণের সামনে হাজির করা আর এক। দ্বিতীয় কর্মের ক্ষেত্রে স্বসমাজ ও ইতিহাস সম্পর্কে, দেশজ ঐতিহ্য ও স্বকাল সম্বন্ধে তীক্ষ্ণ সচেতনতা অবশ্য দরকার। কারণ একজন কবি বা লেখককে সু-অনুবাদের মাধ্যমে নিজের ভাষায় আনার অর্থ সেই সাহিত্য আমাদের সাহিত্য আন্দোলনে, আমাদের সাহিত্য ঐতিহ্যে যথেষ্ট সাহায্য করবে —একথা চিন্তা করা।* তাই তিরিশের সার্থক কবি যখন এলিয়টের অনুবাদে হাত দেন তখন তাঁর কাব্যবোধ, ইতিহাসবোধ ও ঐতিহ্যবোধের প্রতি আমাদের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা জানাতে হয়—যেহেতু এলিয়ট আমাদের কাব্যান্দোলনে নতুন প্রাণসঞ্চারই শুধু করেন নি, আধুনিক ইয়োরোপীয় কাব্যান্দোলনের সঙ্গে আমাদের পরিচয়ও করিয়েছেন।

দুঃখের বিষয়, শ্রীযুক্ত অসিত সরকার অনূদিত জাপানী কবিতায় এই সচেতনতার অভাব লক্ষ্য করলাম। কেন তিনি জাপানী কবিতা অনুবাদ করেছেন, কোন্ প্রশ্ন তাঁকে প্রাচীন আরবী কবিতার অনুবাদে রত না করে জাপানী কবিতায় করেছে—তার কোনো উত্তরই নেই। ফলে, কোনো নির্দিষ্ট পরিপ্রেক্ষিত না থাকার দরুণ তাঁর গ্রন্থ থেকে জাপানী কবিতার কোনো স্পষ্ট রূপও পাই না। জাপানী কবিতার বিভিন্ন যুগে বিকাশের পরিচয়ও এই অনুবাদ গ্রন্থে অনুপস্থিত। একত্রিশ সিলেবল-এর tanka ও সতেরো সিলেবল-এর haiku-র কোনো মূলগত তফাতই এই গ্রন্থ থেকে বোঝা মুশকিল। তাছাড়া জাপানী কবিতামাত্রই ছোট কবিতা এ ধারণাও ঠিক নয়—renga বা লিঙ্কড-ভর্স-এর কথা সর্বদা স্মরণীয়। লিঙ্কড-ভর্স, এর সরলতম-রূপে, ছোটই—দুজন ব্যক্তির লেখা। প্রথম তিন লাইন একজন লিখবে, আর দু লাইন আর একজন। কিন্তু ১৪৮৮ খ্রীষ্টাব্দে Sogi ও তার দুজন শিষ্য মিলে একশো লিঙ্কড-ভর্স লিখেছিলেন। শুধু তাই নয়; কদাচিৎ হলেও লং পোয়েমস বা nagauta-এর পরিচয়ও আমরা জাপানী কবিতায় পাই। এবং ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে জাপানী কবিতায় যে নতুন বিকাশ দেখা গেল তাই হাইকু বা "ফ্রি" লিঙ্কড-ভর্স। এ ব্যাপারে যাঁর নাম প্রথমেই স্মরণীয় তিনি বাশো—যাঁর একটি হাইকু রবীন্দ্রনাথের অনুবাদে আমাদের কাছে

* অবশ্য ক্ল্যাসিক সাহিত্যের অনুবাদের প্রাথমিক স্তরে এ-চিন্তা নাও থাকতে পারে।

পরিচিত। তাছাড়া, গত সত্তর-আশি বছর ব্যাপী জাপানী কবিতায় যে দ্রুত পরিবর্তন এসেছে, ইওরোপের সংস্পর্শে যে নতুন চিন্তা-ভাবনা জেগেছে—তার পরিচয়ও এ গ্রন্থে নেই। অর্থাৎ জাপানী কবিতার বিকাশগত পরিচয়-দানেও এ গ্রন্থ অক্ষম। সে কারণে, জাপানী কবিতার প্রতি শুধুমাত্র উৎসাহ বর্ধনেও এই অনুবাদগ্রন্থ বর্তমানে আমাদের কাব্যভাবনায় কি সাহায্য করবে সেকথা তো ছেড়েই দিলাম। একদা পশ্চিমের ইমেজিস্ট-দের জাপানী কবিতা আকর্ষণ করেছিল—কিন্তু বাংলা কাব্যে এলিয়ট চর্চার পর ইমেজিস্টদের অনুকরণ করা পশ্চাদপসরণ নিশ্চয়ই।

অনুবাদ প্রসঙ্গেও দু-একটি প্রশ্ন ওঠে। শ্রীযুক্ত সরকার তাঁর এক পৃষ্ঠার ভূমিকার শেষে বলেছেন, "তাছাড়া জাপানী ভাষা না জানায় ইংরেজীর উপর নির্ভর করেই অনুবাদ করতে হয়েছে। ফলে মূল কবিতাগুলির সাথে মিলিয়ে দেখা সম্ভব হয় নি। তবে সব সময়েই চেষ্টা করেছি মৌলিকতা বজায় রাখতে।" শেষের বাক্যটিতে শ্রীযুক্ত সরকারের বক্তব্য পরিষ্কার নয়। দ্বিতীয়ত জাপানী কবিতার ইংরেজী ভাষান্তরণও খুবই কঠিন ব্যাপার। কারণ জাপানী কবিতা "Virtuoso in method" এবং "Perfection in details." পশ্চিমী কবিতার সঙ্গে এর বিরোধ প্রত্যক্ষ। এবং ইংরেজী অনুবাদের আরও মুশকিল শব্দ-ভাণ্ডারের দিক থেকে জাপানীর সঙ্গে তার কোনো মিলই নেই। শুধু তাই নয়, অনুভূতির প্রকাশে পুরনো দিনের কারুর কিছু কথা বর্তমানে নতুন এ্যাকসেন্টে জাপানী কবি ব্যবহার করেন—ইংরেজীতে এই পার্থক্যটুকু ধরা প্রায় অসম্ভব। তাই ডোনাল্ড কীন পশ্চিমী পাঠকদের জন্য প্রাথমিক পুস্তক জাপানীজ লিটরেচরে স্পষ্টতই বলেছেন, "...to appreciate Japanese poety fully it must be read in the original." সুতরাং ইংরেজীর ওপর নির্ভর করে বাংলায় জাপানী কবিতার অনুবাদে বিপদ অনেক—মৌলিকতা রক্ষা তো দূরে থাক। সবথেকে বড়ো কথা, ছোট কবিতা লিখলেই হাইকু হয় না। আধুনিক জাপানেও হাইকু লেখা হয়েছে কিন্তু "it remains a real question whether any such short poetic utterances can be called haiku."*

অবশ্য এত কথা বলার কারণ শ্রীযুক্ত অসিত সরকারের প্রচেষ্টা আমাদের

* Modern Japanese Literature—compiled and Edited by Donald Keene. Introduction

ভালো লেগেছে। এবং এ বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণ হলে, আশা করি, তিনি এসব কথা ভেবে দেখবেন। ছাপা, বাঁধাই, প্রচ্ছদ মোটামুটি।

প্রথম দিনের সূর্য ॥ মঞ্জুষ দাশগুপ্ত ও অমিত ব্রহ্ম। গ্রন্থ নিলয়। দু টাকা।

তরুণ কবিদের কাব্যগ্রন্থ সর্বদাই কবিতাপাঠকের উৎসাহের উৎস। কবিতাগ্রন্থ পাঠের পর কবি সম্বন্ধে সেই উৎসাহ বজায় থাকল কিনা—এই প্রশ্নের মীমাংসায় তরুণতর কবির শক্তির পরিচয় নিশ্চয়ই পাওয়া যায়। বলতে দ্বিধা নেই, 'প্রথম দিনের সূর্য'-এর মঞ্জুষ দাশগুপ্ত তাঁর সম্বন্ধে আমার উৎসাহকে তীব্রতরই করেছেন। তার অর্থ এই নয় যে তাঁর সব কবিতা ত্রুটিহীন। বরঞ্চ অধিকাংশ কবিতাই ত্রুটিপূর্ণ—ছন্দের অস্বাচ্ছন্দ্য ("সূর্য-প্রণাম করা হোলো না আমার এ সকালে"—বিজয়িনী), শব্দপ্রয়োগে শিথিলতা ("হাওয়ার মাতলামিসহ রেখে যাবে বর্ষার মৌসুমী"—বর্ষার মৌসুমী), তারল্য ও চটুলতার প্রতি কদাচিৎ হলেও, আকর্ষণ—প্রভৃতি নানা ত্রুটি 'প্রথম দিনের সূর্য'-এর প্রথম অলিন্দের কবিতাবলীতে সহজেই পাওয়া চলে। কিন্তু এ সবের পাশাপাশি মঞ্জুষ দাশগুপ্ত যে পদ্য লেখেন না, কবিতা লেখেন, অন্তত লেখার জন্য সৎ প্রচেষ্টায় রত, তার প্রমাণ পাওয়া যায় 'অবিনাশ' ও 'আত্মস্থ তাপস' কবিতাদুটিতে, 'ক্রীড়নক' কবিতার কোনো ছত্রে। যদিও কাঁচা হাত, তথাপি মঞ্জুষ দাশগুপ্ত যে ছড়ার ছন্দে কিংবা ধ্বনিপ্রধানে কবিতা লেখেন তাও লক্ষণীয়—বিশেষত বর্তমানে, যখন সাম্প্রতিকতম কবিরা তানপ্রধানকেই প্রায় একমাত্র ছন্দ হিসাবে বেছে নিয়েছেন। অবশ্য এ ব্যাপারে মঞ্জুষ দাশগুপ্তকে বিশিষ্ট বলছি না, কারণ এই ছন্দের কবিতাগুলি এতই অপটু যে কোনো বিশিষ্টতার দাবি তারা রাখে না। এছাড়া, স্বাস্থ্যকর ঠেকে আধুনিক কোনো কোনো বাঙালী কবির (হয়তো তাঁরা কবির প্রিয়) ছায়াপাত। কিন্তু এ সব শুভলক্ষণই কবির যথার্থ কাব্যচিন্তার অপেক্ষায় আছে—যদি বিশিষ্ট কাব্যভাবনা—স্বসমাজ, ইতিহাস, ঐতিহ্য সম্বন্ধে সচেতনতা—না জাগে ; কি, দ্বন্দ্বময় বিকাশে আমাদের সমাজের বিকাশ, সে-কথার আমল তিনি না দেন—তাহলে কিছু মিঠে মিঠে প্রেমের কবিতা,—চটুল ও তরল কবিতা লিখেই এই প্রতিশ্রুতি শেষ হবে।

'প্রথম দিনের সূর্য'-এর দ্বিতীয় অলিন্দের কবি শ্রীঅসিত ব্রহ্ম-র কবিতায়

এখনও কোনো প্রতিশ্রুতি নেই—প্রায় সব কবিতাই অতি কাঁচা। পুস্তকাকারে কবিতাগুলি প্রকাশ করার পূর্বে তিনি একটু চিন্তা করলে পারতেন।

পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়

চারচোখ ॥ আধুনিক কাব্যনাট্য সংকলন। প্রতিভা। তিন টাকা ॥

কাব্যনাট্যকে কবিতা ও নাটকের উভয় কূলই বজায় রাখতে হয়। কাব্যনাট্য নিশ্চয়ই নাটক, কিন্তু এ-ক্ষেত্রে নাটকের গতি ও সংঘাত প্রকাশিত হয় কাব্যিক ব্যঞ্জনায়। গদ্যনাটকে যা বহিঃসংঘাতে বা ঘটনাপ্রবাহে ব্যক্ত, কাব্য-নাটক কবিতার রসে সিক্ত বলেই অন্তর্লোকের আলোকে তা প্রকাশিত হতে চায়। সেজন্য কাব্যনাট্যের দ্বন্দ্ব মানসিক-সংঘাত উত্থিত এবং সকলেই জানেন যে অন্তরের আবেগ কাব্যের চিত্রকল্প, প্রতীক প্রভৃতির মাধ্যমে সংহত, ইঙ্গিতময়, তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে অনায়াসে। তাই মানসিক দ্বন্দ্ব পরিস্ফুট করার জন্য যখন কবিতায় আশ্রয় অনিবার্য হয়, তখনি কাব্যনাটকের সার্থকতা ; পক্ষান্তরে আড়ম্বর, উপকরণ, নাটকীয় গুণ সত্ত্বেও বহু কবিতা কাব্যনাট্য নয়, এ-কথা যে কোনও রসিক পাঠকই উপলব্ধি করবেন। নাটক ও অভিনয়যোগ্যতা সম্পর্কে কাব্যনাট্যকারের চেতনা তাই প্রাথমিক গুণাবলীর অন্যতম। কবিত্বের আধিক্যে নাটক নষ্ট হয়, অন্যপক্ষে নাটকীয় সংঘাত ও গতি কাব্যিক আমেজে মণ্ডিত না হলে সাধারণ নাটকের সঙ্গে কোনোই পার্থক্য থাকে না, ফলে শুধু নাটকের আঙ্গিকে কবিতাকে প্রকাশ করলেই চলে না ; বিষয়বস্তু, ঘটনা, পরিস্থিতি, চরিত্রের মানসিক অবস্থা প্রভৃতি নির্বাচনে নাটকীয় সংঘাতের অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন থাকতে হয়। দ্বন্দ্ব-সংঘাতের অর্থ জীবনের জটিল বিস্তীর্ণ পটভূমিতে সম্পর্ক নিরূপণ, যে-জন্য সমাজ ও ব্যক্তির সম্বন্ধ-নির্ণয় ওই প্রেক্ষিতে অমোঘ হয়ে দাঁড়ায়। ইতিহাস, সমাজ, দেশ, কাল ও ব্যক্তির নিরন্তর জটিলতা অন্বেষণ যেমন শিল্পের অন্যান্য বিভাগের আদর্শ, তেমনি কাব্যনাট্যকারকে ওই আদর্শে যাবতীয় ঘটনাবলীর তন্ময় ও মন্ময় সত্তা সম্পর্কে চিন্তিত হতে হয়। আশার কথা, আলোচ্য সংকলনের লেখক চতুষ্টয় তুলনায় তর-তম হলেও এ-সম্পর্কে সচেতন।

প্রেমের উৎস সন্ধান, সেই সঙ্গে সমকালীন জীবনের জটিলতা প্রেমকে বিপন্ন করে তুলেছে—এমন বোধই কৃষ্ণ ধর ও রাম বসুর রচনায় অতি তীক্ষ্নরূপে প্রকাশিত। কৃষ্ণধরের 'দ্বিতীয় নায়িকা'-র নায়ক অমল একদা প্রেমের

বন্ধনেই পরিণয়ে আবদ্ধ হয়েছিল রমার সঙ্গে ; অথচ "সময়ের নির্মম ব্যবহারে / আমরা বদলে যাই," ফলে হৃদয় থেকে প্রেম ঝরে পড়ে। ঝরে পড়লেও অমল চায় সেই অনাদিকালের মুখটিকে "আমার স্বপ্নে দেখা মুখ দেখবো বলে", তাই নায়কের অস্থিরতা ও সঙ্গে সঙ্গে উত্তরণ ও মুক্তির প্রচণ্ড প্রয়াস, "তুমি যদি নদী হও, আমি তাতে ডুব দিই, / নদী হও, নদী হও যদি।" এই মানসিক দ্বন্দ্বই 'দ্বিতীয় নায়িকা'-য় গতি ও সংঘাত সঞ্চার করেছে। জয়তী দ্বিতীয়-নায়িকা, সে চায় অমল সহজ হোক, কারণ "সহজ হলেই কিন্তু হৃদয়কে পাওয়া / যায়, ছোঁয়া যায় তাকে।" অমল মনে মনে জয়তীর কথা স্বীকার করলেও স্ব-নির্মিত জাল ছিন্ন করে বেরিয়ে আসতে পারে না, কারণ অমল নার্সিসাস, সে নিজেকে অতিরিক্ত ভালোবাসে, নিজেকে নিয়েই মগ্ন। কৃষ্ণ ধর অমলের দ্বিধায় ছিন্নভিন্ন মূর্তি প্রচ্ছন্ন চিত্রকল্পের সাহায্যে উজ্জল করে তোলেন এবং নেপথ্যে কণ্ঠস্বরের মাধ্যমে-অমলের অস্থিরতাকে শীর্ষে নিয়ে আসেন। অবশ্য রমার অভিমানাহত ক্ষুব্ধতা, জয়তীর করুণ দৃঢ়তা, অরুণাংশুর হালকা চালে দার্শনিকতা অতি স্বল্প আয়োজনে পরিস্ফুট করেন।

অবশ্য রাম বসু প্রতীক ও চিত্রকল্পের ব্যবহার প্রকাশ্যে প্রায় সোচ্চারে করেছেন :

"সমুদ্রের শেষহীন ওঠা পড়া, সেই / নিষ্কলুষ নগ্নতায় আমি যেন আদিম কৃষক / তোমার চুলের মধ্যে বিভ্রান্ত জোনাকি, অথবা "জলকণা পাপড়ির মত মুখে ঝরে বলে," অথবা "জীবনের গভীর বিপদে / একটা রাগিনী যেন কোন এক গুণীর গলায়।" অথবা "কাঠ ও পাশুটে মৃত মাছের মতন / কি ভীষণ অর্থহীন, দীন।" অথবা "এমন কি কাঁকড়াগুলো / আমরা যে তাও নই।"

অথচ সেজন্য কখনই 'তন্দ্রা ভেঙে ফেরা' নাটকীয়গুণ বর্জিত হয় নি, বরং রাম বসুর কৃতিত্ব এইখানে যে তিনি জন্মরহস্যকে কেন্দ্র করে কাব্যনাট্যটিতে নাটকীয় পরিবেশ, মধ্যে মধ্যে ছোট্ট মেয়ের হারিয়ে যাওয়ার ভীতি যুক্ত করে এবং এক ফাঁকে স্মৃতি-চারণার দ্বারা গতি ও সংঘাত সৃষ্টি করেছেন, ফলে নাটিকাটিতে প্লট অংশে যথেষ্ট কৌতূহলের সঞ্চার হয়েছে। আলোক ও শিখার প্রেমের মধ্যে দুর্ভেদ্য প্রাচীর হচ্ছে আলোকের ছিন্নমূল সত্তা, সেই সত্তার মূল প্রোথিত আছে আলোকের জন্মলগ্নে, তাই সে ভালোবাসা পেয়েও যেন কিছু পায় নি। কারণ তার মতে "আমাদের এ জীবন চারপাশে প্রত্যক্ষের মত / নিরর্থক।" বস্তুত আলোক হচ্ছে আউটসাইডার, কিন্তু শিখাও কি সেই

একই সংশয়ে দ্বিধান্বিত? কামনার উচ্চ-শীর্ষে শিখাও তো আলোকের মৃত্যু কামনা করেছে। রাম বসু অতি দক্ষতার সঙ্গে আলোক ও শিখার দ্বন্দ্ব-মথিত চিত্রটি তুলে ধরেছেন। আলোক ও শিখার মতো চরিত্রের সমাপ্তি সাধারণত হয় আত্মবিনাশে, রাম বসু ছোট্ট মেয়েটিকে এইখানেই অতি সুন্দরভাবে সংযোগ সেতু হিসেবে ব্যবহার করেছেন। ছোট্টমেয়েটি যেন অলক্ষ্যে প্রতীক হয়ে উঠেছে। "তন্দ্রা ভেঙে ফেরা" তাই শেষ হয়েছে ইচ্ছা ও ঈপ্সিত—দুই সত্তায় রূপান্তরে। রাম বসু ও কৃষ্ণ ধর উভয়েই সমকাল দ্বারা আক্রান্ত এবং উভয়েই রোমান্টিক, কিন্তু কৃষ্ণ ধর যেখানে কাব্যিক-ব্যঞ্জনাকেই মূল আশ্রয় করেছেন, রাম বসু সেখানে আপাত নির্মম, রূঢ়তার মধ্যে প্রবেশ করিয়েছেন সুর; প্রথমজনের মুখ্য অবলম্বন মানসিক দ্বন্দ্ব, দ্বিতীয়জন বর্হিঘটনাকেও যথেষ্ট মর্যাদা দিয়েছেন।

অন্যদিকে গিরিশংকর সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র মেজাজে 'চেরাগ বিবির হাট'-এ প্রেমের সনাতন সমস্যা তুলে ধরেছেন। নারীর আকর্ষণ বীর্য, অর্থের প্রতি, না, পুরুষের অনুচ্চারিত প্রেমের প্রতি—গিরিশংকর কাব্যনাট্যটিতে তাই উজ্জল করে তুলে ধরতে চেয়েছেন গ্রামীণ পটভূমিতে মাটির কাছাকাছি মানুষদের নিয়ে। 'মৈমনসিং গীতিকার' যে-দুটি ছত্র তিনি উদ্ধার করেছেন, সেই ছত্র দুটি প্রমাণ করে গ্রাম্যভাষায় কবিত্ব কত উজ্জল অথচ কোমলভাবে প্রকাশ করা যায় এবং গিরিশংকর বাউলের গানেও সে-প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। হাটুরেদের সংলাপ ও আচরণে, হাটের বর্ণনায় লেখক একটি সজীব চিত্র তুলে ধরেছেন। অর্জুনের কথোপকথন, অর্থের প্রাচুর্যে স্ফীত দৃঢ়তা এবং আচরণ অতি সহজে আমাদের আকর্ষণ করে। মুহূর্তে অর্জুন বিশিষ্ট ব্যক্তি হয়ে ওঠে। অর্জুনের প্রতি-তুলনায় নবীনও তার নীরব ভালোবাসা, তার ছোট্ট পট নিয়ে আমাদের মনহরণ করে। চেরাগ-বিবি তাই অর্জুন ও নবীনের সরব ও নীরব প্রেমের দোলায় দুলতে থাকে। অবশ্য প্রথমে অর্জুন-ই তাকে আকর্ষণ করে এবং অর্জুনের কাছে আত্মসমর্পণে তার এতটুকু দ্বিধা দেখা যায় না, কিন্তু নবীনের পট হাতে নিয়ে সে বুঝতে পারে প্রেমের গভীরতা ও আকুতি, তাই শেষে সে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে, তখনই চেরাগ বিবির হাটের উপর যবনিকা নেমে আসে। প্রাত্যহিক জীবনে হঠাৎ শাশ্বতের দোল খেয়ে 'চেরাগ-বিবির হাট" সংঘাত ও দ্বন্দ্বমুখর হয়ে উঠেছে ও বুড়ো দাঁড়কাক হিসেব মিলাতে গিয়ে আশ্চর্য হয়ে যায়। 'চেরাগ বিবির হাট' কাব্যনাট্য তাই এই দ্বন্দ্ব ও

জটিলতায় গতি ও নাটকের সংঘাত অর্জন করে। কিন্তু গিরিশংকর প্রতীকের অতি মর্যাদা দিতে গিয়ে প্রথমদিকে যে লৌকিক পরিমণ্ডল সৃষ্টি করেছিলেন এবং যা কাব্যনাট্যটিকে আকর্ষণীয় করে তুলেছিল, সেই লৌকিক রসকে বহু পরিমাণে ব্যাহত করেছেন। কারণ বাউলের গানের পর হাটুরেদের সংলাপ পর্যন্ত যে-পরিমণ্ডল তৈরি হয়েছিল, লেখক অর্জুন, দাঁড়কাক ও চেরাগ বিবির মুখে এমন মার্জিত ও বইয়ের সংলাপ আরোপ করলেন, যেজন্য আমরা কিছুতেই এদের বাস্তব-অস্তিত্ব সম্পর্কে নিঃসংশয় হতে পারলাম না, উপরন্তু চেরাগ বিবি যখন বলে, "অনন্তকালের মাঝে আজকের যে দিনটা ফুরিয়ে গেল। তুমি তার উত্তম পুরুষ।" তখন বিমূঢ় হই, মনে হয় অমিত রায় যেন কথাগুলো বলছেন। চেরাগ বিবি যদি তার আপন ভাষায় (যেমন বাউলের গান) এই কথাগুলো উচ্চারণ করত তবে তার গভীরতা হতো অতল-স্পর্শী এবং তা বাস্তব ও বিশ্বাস্য হয়ে উঠত। গিরিংকর নাটকীয় পরিবেশ রচনায় অতি দক্ষ, কিন্তু মাটির কাছাকাছি মানুষদের সংলাপ ব্যবহার করলে আমরা সেই ভাষার ক্ষমতা সম্পর্কে সচেতন হতাম ও পরবর্তী লেখকদের মনোযোগ আকর্ষণ করত এবং গিরিশংকরও একটি মহৎ কর্ম সম্পাদন করতেন সন্দেহ নেই।

দিলীপ রায় যে-ভঙ্গির আশ্রয় নিয়েছেন, সে-ভঙ্গি কবিতার পক্ষে উপাদেয় হলেও, নাটকের পক্ষে উপযুক্ত কিনা বিবেচ্য। বিচ্ছিন্ন সংলাপের মাধ্যমে তিনি একটি সমস্যা ধরতে চেষ্টা করেছেন, কিন্তু সেই কেন্দ্রীয় সমস্যার মধ্যে যে নাটকীয় গুণাবলী আছে—দিলীপ রায় হয়তো স্বেচ্ছায় তা পরিহার করেছেন। তিনি হয়তো বিচ্ছিন্নতার মাধ্যমে ঐক্যসন্ধানে সচেষ্ট, কিন্তু কবিতার আধিক্য তাঁর ইচ্ছায় বাদ সেধেছে। টুকরো টুকরো কয়েকটি পংক্তি অতি সুন্দর, অথচ পাত্র-পাত্রীদের সংলাপগুলো একটি সূত্রকে কেন্দ্র করেও যেন এক-একটি দ্বীপ সৃষ্টি করেছে। শেষের দিকে অবশ্য গতি ও সংঘাত এসেছে, কিন্তু কবিত্বের অতি-প্লাবনে তাতে নাটকীয় পরিবেশ ভেসে গেছে। নতুন ভঙ্গিতে কাব্যনাট্য রচনা করতে গিয়ে দিলীপ রায় শ্যাম এবং কুল দুই রক্ষা করতে পারেন নি বলে আমার বিশ্বাস, তবু এ-প্রচেষ্টা প্রশংসার্হ।

বাংলা সাহিত্যে কাব্যনাট্য আন্দোলনের জোয়ার এসেছে, আলোচ্য গ্রন্থের লেখকগণ তার সক্রিয় অংশীদার। তাই আশা করব এঁদের অক্লান্ত লেখনী কাব্যনাটকের ধারাকে নানাভাবে পুষ্ট ও বিকশিত করবে।

কুশল লাহিড়ী

মঙ্গলা (মরাঠী উপন্যাস)। আন্নাভাউ সাঠে। অনুবাদ : বোম্মানা বিশ্বনাথম্। নয়া প্রকাশ, কলকাতা-ছয়। দু' টাকা।

"ভৌগোলিক অভিধায় ভারত একটি দেশ মাত্র, কিন্তু আসলে এ এক মহাদেশের পর্যায়ে পড়ে। বহু জাতি বাস করে ভারতে, তাদের, রীতিনীতি আচার ব্যবহার সবই ভিন্ন। তবু মনের জগতে রয়েছে এক অখণ্ড ঐক্য, এক হার্দিক আত্মীয়তা।" অনুবাদকের ভূমিকায় ভারতবর্ষের বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষের সহস্র বৈষম্যের মধ্যেও ঐক্যের অখণ্ডতার উপর গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে—ভাব-সংস্কৃতি বিনিময়ের মাধ্যমে।

বাংলা সাহিত্যের 'অনুবাদ' শাখাটি সম্প্রতি বেশ সমৃদ্ধ। বিশেষত ইওরোপীয় সাহিত্যের অনুবাদকর্মই সংখ্যার দিকে বেশি। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের সাহিত্যের বাংলা অনুবাদ এখনো বিরলদৃষ্ট।

শ্রীযুক্ত বোম্মানা বিশ্বনাথম অবশ্যই এ কার্যের একজন পুরোধা হিসেবে প্রশংসা দাবি করতে পারেন।

"দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পর্যন্ত মারাঠী কথাসাহিত্যের মুখ্য উপজীব্য বিষয় ছিল স্বর্গীয় ও মানবিক প্রেম, প্রকৃতি ও দেশাত্মবোধ। পরবর্তীকালে বহু মরাঠী তরুণ সাহিত্যিক মার্কসীয় দর্শনের দ্বারা প্রভাবিত। তাই পুরাতন রোমান্টিক প্রভাব কাটিয়ে মরাঠী কথাসাহিত্যে বাস্তবধর্মিতা দেখা দিয়েছে।" ভূমিকার এই অংশটি বর্তমান মারাঠী সাহিত্যের প্রকৃতি ও ধারা সম্বন্ধে বাঙালী পাঠকদের আকৃষ্ট করবে সন্দেহ নেই।

'মঙ্গলা' অগ্নিযুগের পটভূমিকায় রচিত অন্যতম শ্রেষ্ঠ একটি মরাঠী উপন্যাস। সাম্যের আদর্শে উদ্বুদ্ধ বিপ্লবী নায়ক হিন্দুরাও এই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র। হিন্দুরাও ও তার সঙ্গীদের বীরত্ব, আত্মত্যাগ, সমাজবোধ প্রভৃতি কাহিনীর মূল উপজীব্য।

আখ্যানবস্তু : বিয়াল্লিশের সত্যাগ্রহী মনেপ্রাণে গান্ধীবাদী নাগোজী প্যাটেল পরবর্তীকালে ইংরেজ সরকারের পেটোয়া দালালে রূপান্তরিত হয়ে যথেষ্ট প্রভাব প্রতিপত্তি অর্জন করে। তার বিশ্বাসঘাতকতায় প্রাণ দিতে হয় হিন্দুরাওয়ের একজন বিশ্বস্ত বন্ধু ও সহকর্মীকে। ক্রুদ্ধ হিন্দুরাও প্রতিহিংসায় জলে ওঠে। নাগোজীকে শাস্তি দিতে সদলবলে সে যাত্রা করে নাগোজীর আস্তানা চিথলবাড়ি গ্রামের দিকে।

কৃষ্ণাজী মঙ্গলা গ্রামের একজন অবস্থাপন্ন গৃহস্থ। অনেক জমির মালিক এই লোকটি তার অকপট চরিত্রের জন্য গ্রামবাসীদের শ্রদ্ধার পাত্র। তার ছেলে হাম্বীর চরিত্রে ঠিক তার বিপরীতধর্মী। সে নাগোজীর অনুচর। মঙ্গলা কৃষ্ণাজীর পরমাসুন্দরী মেয়ে। মনেপ্রাণে সে নাগোজীকে ঘৃণা করে আর বিপ্লবী নেতা হিন্দুরাওয়ের বীরত্ব কাহিনী শুনে সে হৃদয়ে পোষণ করে হিন্দুরাওয়ের সঙ্গে মিলিতহবার আকাঙ্ক্ষিত স্বপ্ন।

নাগোজী মঙ্গলাকে বিয়ে করতে চায়। হাম্বীরও নাগোজীকে ভগ্নীপতি করে নিতে ব্যগ্র। কিন্তু সরলপ্রাণ কৃষ্ণাজী ঠিক যেন সমর্থন করতে পারেন না এই প্রস্তাবকে। আবার প্রতিবাদ করবার শক্তিও তাঁর নেই।

ইতোমধ্যে নাগোজীকে শাস্তি দেওয়ার সুযোগ খুঁজতে হিন্দুরাও সদলে হাজির হয় মঙ্গলা গ্রামে। কৃষ্ণাজীর সঙ্গে পরিচিত হয় সে। মঙ্গলার রূপে গুণে মুগ্ধ হিন্দুরাও তাকে পত্নীরূপে পাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করে।

আক্রোশে ফেটে পড়ে নাগোজী ও হাম্বীর। সজ্ঘাত আসন্ন হয়ে পড়ে। সঙ্গীহীন হিন্দুরাও মঙ্গলাকে সঙ্গে নিয়ে নাগোজীর দলবল আর পুলিশের যৌথ আক্রমণের সম্মুখীন হতে বাধ্য হয়। বেঁধে ওঠে এক বিচিত্র লড়াই। মাত্র দুটি লোক, যার মধ্যে একজন নারী, বন্দুক নিয়ে রুখে দাঁড়ায় আক্রমণকারী গোটা দলটাকে।

নাগোজী নিহত হয় হিন্দুরাওয়ের গুলিতে।

কিন্তু শেষপর্যন্ত এই অসম যুদ্ধের ছেদ টানা হয় এক করুণ অথচ উদ্দীপক পরিণতিতে। শেষ সম্বল দুটি কার্তুজে হিন্দুরাও আর মঙ্গলা আত্মহত্যা করে পুলিশের হাতে ধরা পড়বার আশঙ্কায়। এই মৃত্যুতে বাঁধা পড়ল দুটি মৃত্যুহীন সংগ্রামী জীবন—হিন্দুরাও ও মঙ্গলা। ইতিহাসের অমোঘ পথে পিছু হটল আক্রমণকারীরা—এই ইঙ্গিতের মধ্যে উপন্যাসের সমাপ্তি।

উপন্যাসটির প্রধান গুণ—লেখকের সহজ সরল বর্ণনাভঙ্গী; অনুবাদকের কৃতিত্ব এস্থলে অনস্বীকার্য।

চরিত্রসৃষ্টি অনবদ্য। হিন্দুরাও যথার্থই বিপ্লবী নেতা হওয়ার যোগ্য চরিত্র। কৃষ্ণাজী, মঙ্গলা ও রাধাবাঈ বাস্তবধর্মী।

বিশ্বাসঘাতক নাগোজী পুলিশের ইনফর্মার। এই চরিত্রটি পাঠকের ঘৃণার উদ্রেক করবে—আর এখানেই এ-জাতীয় চরিত্র সৃষ্টির সার্থকতা। হাম্বীরের মধ্যে কিঞ্চিৎ আতিশয্য লক্ষিত হয়।

অন্যান্য চরিত্রের মধ্যে হিন্দুরাওয়ের অনুগামী গণু, মলহারী প্রভৃতি সার্থক। চন্দুকে নাগোজীর যথার্থ অনুচর রূপে চিত্রিত করা হয়েছে।

রাজনৈতিক বক্তব্য থাকলেই সাহিত্য যে কেবলমাত্র 'প্রোপাগাণ্ডা' হয়ে দাঁড়ায় না 'মঙ্গলা' তারই প্রমাণ।

প্রচ্ছদপট সুন্দর। ছাপা, বাঁধাই যথাযথ। মাত্র দু'টাকা দাম হওয়ার জন্যে সাধারণ পাঠকের পক্ষেও বইটি অনায়াসলভ্য।

উপন্যাসটির বহুল প্রচার কামনা করি।

চিন্ময় গুহঠাকুরতা

পিপাসা। চিত্তরঞ্জন ঘোষ। বিংশ শতাব্দী প্রকাশনী। তিন টাকা পঞ্চাশ ন. প.।

নায়িকার আত্মহত্যায় 'পিপাসা'র গল্পের শুরু। অর্থাৎ তারপর (ফ্ল্যাশব্যাকে) ঐ আত্মহত্যার কারণ প্রমাণে সমগ্র উপন্যাসটির উপস্থাপনা। মেয়েটির নাম বেলা। স্বাভাবিক স্বাস্থ্যল জীবনের প্রতি যার আজন্ম পিপাসা ছিল। তবু 'কেন আত্মহত্যা করল বেলা।' এর উত্তরও বেলার জবানিতে পাওয়া যায়, 'জীবন ব্যাপারটাই অদ্ভুত। সবটুকুর অর্থ খুঁজে পাওয়া যায় না।'… এবং এই 'জীবন'-এরই অর্থসন্ধান একসময় মিটিয়ে দিয়ে তার বীভৎস স্বেচ্ছামৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে সে একটা আন্দাজ পেল: 'দেহকে ঘিরে যে মন-পোড়ানো আগুন জলে, তা আমি জানতুম, চিনতুম। কিন্তু আত্মায় যে আগুন লাগে সে জালা আমার অজানা ছিলো।' অর্থাৎ, প্রেম?—অথচ ইতিমধ্যেই বেলার শরীরে শহুরে রাত্রির ছোবল বহুবার লেগেছে। সুতরাং সোনার হরিণের আকাঙ্ক্ষায় না হোক, অন্তত 'নিজেকে ভালোবেসেই' বেলা অবশেষে বিবাহ করতে পারল। এবং যাকে বিবাহ করল, তারও মৃত্যু হলো। আত্মহত্যা। কিন্তু বেলার মনে হলো, সে-ই হত্যা করেছে ঐ ভদ্র যুবকটিকে। কেন না সে তাকে ভালোবাসে না, 'আর একজনকে বাসে'।

এই কাহিনীর ভিতরে কোনো বিশেষ জটিলতা টেনে আনবার চেষ্টা করেন নি শ্রীচিত্তরঞ্জন ঘোষ। গল্পাংশকে খুবই সরল ভাষা-ভঙ্গির মাধ্যমে উপস্থিত করেছেন লেখক, এবং তা সময়োচিত, বলতে পারি। উৎকেন্দ্রিক ও বিকৃত মানসিকতা যা আজ প্রায় চতুর্দিকেই সঞ্চারিত, তারই আলোড়নে বেলা ক্ষুব্ধ, আহত। দু-দণ্ডের শান্তি বেলা চায় নি, বেলার তৃষ্ণা ছিলো আরো বড়ো,

বিস্তৃত জীবনের লক্ষ্যের প্রতি। কিন্তু সে ব্যর্থ হয়েছে, এই ধারণায় তাকে আত্মহত্যা করতে হলো ঘুমের ওষুধে।—এবং এইখানেই আমার প্রশ্ন, এই আত্মহত্যা কী প্রতীকী? যে-বেলা নিজের দেহকে ও বাঁচাকে ভালোবাসবার পরে স্বগতকে প্রার্থনা করে এত বৈচিত্র্যে ও কৃত্রিমতায় অভ্যস্ত হয়ে উঠতে শিখেছিল (কোনোরকম অসম্ভব-কিছু-করছে-মনে-না-করে), তার ভালোবাসার নিয়মে (?) আরো একটু adjustment আশা করা আমাদের কি খুব অন্যায় হতো? বিশেষত, প্রথমাবধি এই মেয়েটির ব্যবহার ইত্যাদি থেকে তেমনই একটা আশাবাদ ছড়িয়ে দেবার উদ্দেশ্য ছিলো যখন লেখকের; অভ্যাসই দ্বিতীয় প্রকৃতি—এমন কথাটাই যখন পুনর্বার বেলার বিবিধ আচরণে প্রায়-প্রকাশিত, তখন কেন আত্মহত্যা?…না হয় ধরে নেওয়া গেল, স্বগতর প্রতি বেলায় টান—বাঁক নিতে-নিতে-যাওয়া নদীর মতো সমুদ্রেরই দিকে, তথাপি মোহনার বিপুল মিলনে নদীর যে উত্তরণ, তা বেলার আত্মহত্যায় কতটা প্রমাণিত? তাই জানতে চাইছিলাম, আত্মহত্যাটি কী প্রতীকী? কিন্তু কেনই বা ঐ প্রতীক?

কল্লান্ত। বৈদ্যনাথ ঘোষ। অগ্রণী বুক ক্লাব। পাঁচ টাকা।

শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ ঘোষের উপন্যাস 'কল্লান্ত'-র প্রথমদিককার মূল ঘটনাস্থল 'আদি কলকাতার আদি গলির মোড়ে ক্লাইভের আমলের দ্বিতল বাড়ি'। এবং শেষাংশে বর্ণিত হয়েছে 'ভারত-ছাড়ো' আন্দোলনের জোয়ারে তরঙ্গিত সেই তখনকার চৌরঙ্গীর এক নিষিদ্ধ স্বদেশী অধিবেশনের উচ্ছসিত দীপ্তি। মধ্যবর্তী কাহিনীটুকুতে—তৎকালীন ক্রমে-ধ্বসে-পড়া বনেদিয়ানার নানা বিপরীতমুখী চরিত্রের আসা-যাওয়ার-পটভূমিতে অঙ্কুরিত নতুন মূল্যায়নের প্রতি বিশ্বাসী যুবসমাজের চিন্তাউচাটনের যন্ত্রণা বিধৃত। প্রতিটি পরিচ্ছেদের প্রারম্ভ ও ভাষা কিছুটা নাটকীয় ভঙ্গিতে রচিত হওয়ায়, মনে হলো, লেখক তাঁর বিশ্লেষণের বিজ্ঞানসম্মত নিরপেক্ষতায় বা গাম্ভীর্যে স্থির থাকতে পারেন নি। ফলত, পর্যবেক্ষকের অবশ্য প্রয়োজনীয় দূরত্বটুকু সর্বক্ষণ বজায় থাকে নি। কিন্তু তৎসত্ত্বেও, ঈশ্বরদা ও সোনাদি—দুটি সহজ, অবিস্মরণীয় মানুষ হয়ে উঠেছেন। এবং বোধকরি উপন্যাসের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ প্রতিনিধি স্বরেন, যার স্বল্পক্ষণের উপস্থিতি এই কাহিনীটির অশেষ উপকার করেছে—যার কথা না-জানাতে-পারলে ঔপন্যাসিকের দায়িত্ব সম্পূর্ণ হতো না।…মনে হলো, হয়তো 'কল্লান্ত' একাধিক খণ্ডে রচনা করার ইচ্ছা আছে শ্রীঘোষের, তা যদি হয়, তবে পাঠকদের পক্ষ থেকে আগামী খণ্ডগুলির জন্য আমরা উৎসুক থাকলাম।

অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়

বিজ্ঞানাচার্য নীল্‌স্ বোর

নব্য পদার্থবিজ্ঞানের জনকরূপে যাঁরা বিশ্ববিদিত, সেই রাদারফোর্ড, ম্যাক্স প্লাংক ও আইনস্টাইনের পাশেই আসন গ্রহণ করেছেন নীল্‌স্ বোর। গত বছর ১৮ই নভেম্বর সাতাত্তর বছর বয়সে এই মহাবিজ্ঞানীর মহাপ্রয়াণ ঘটেছে। আজ মনে পড়ছে ১৯৬০ সালের ২০শে জানুয়ারি দিনটি। নীল্‌স্ বোর এসেছিলেন কলকাতায়। বিজ্ঞান কলেজের নিউক্লিয়র ফিজিক্স ইনষ্টিটিউটে কলকাতার বিজ্ঞানীকুল ও ছাত্রদের ভিড় জমেছিল এই বিজ্ঞান-তপস্বীকে দেখবার ও তাঁর কথা শোনবার জন্যে। সেই জনসমাবেশ দেখে মনে হতে পারত যেন কোনো মন্দিরে এসেছেন পূজারী ভক্তের দল। পক্ককেশ, অপূর্ব সৌম্যভাবমণ্ডিত চেহারার মানুষটি সামনে এসে দাঁড়ালেন এবং পরমাণুর রহস্যপুরীর কি মুক্তো আহরণে নিযুক্ত আছেন তিনি ও তাঁর সতীর্থরা, ভাব-গম্ভীরকণ্ঠে তারই কাহিনী পরিবেশন করলেন। সেই দিনটির কথা কোনো-দিনই ভোলা যাবে না।

ছাত্রজীবন ও গবেষণা

নীলস্ বোর ডেনমার্কের অধিবাসী। রাজধানী শহর কোপেনহাগেনে ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই অক্টোবর তাঁর জন্ম হয়। কুড়ি বছর বয়েসেই বোর পারমাণবিক পদার্থবিজ্ঞানের গবেষণায় লিপ্ত হয়ে পড়েন। মাত্র ছাব্বিশ বছর বয়সে তিনি পদার্থবিজ্ঞানে পি-এইচ-ডি ডিগ্রী লাভ করেছিলেন। এরপর ইংলণ্ডের ম্যানচেষ্টারে ক্যাভেণ্ডিস্ ল্যাবরেটরীতে কিছুদিন গবেষণার পরে তিনি ইংরেজ পরমাণুবিজ্ঞানী রাদারফোর্ডের গবেষণাগারে যোগদান করেন। ১৯১২ সাল থেকেই বোর পরমাণুবিজ্ঞান জগতে নিজের আসনকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে নিয়েছিলেন।

১৯১৩ সালে বোর স্বদেশে ফিরে এসে কোপেনহাগেন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা ও গবেষণার কাজে নিযুক্ত হলেন।

১৯২১ সালে গামা রশ্মির বিচ্ছুরণ বিষয়ে পরীক্ষাকাজের ফলে রাদারফোর্ড

পরমাণুর আভ্যন্তরীণ গঠন সম্পর্কে একটি ধারণা উপস্থিত করলেন। তিনি বললেন পরমাণুর দুটি অংশ—একটি তার কেন্দ্রীণ, যেখানে রয়েছে ধনাত্মক প্রোটন কণিকা, অপরটি, সেই কেন্দ্রীণের চতুর্দিকে নির্দিষ্ট কক্ষপথে ভ্রাম্যমান ঋণাত্মক কণা ইলেকট্রনের দল। পরমাণুর এই চেহারাকে তিনি উপমিত করলেন সৌরমণ্ডলের সঙ্গে, যেখানে সূর্যকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন কক্ষপথে চলেছে ন'টি গ্রহের আবর্তন।

বোরের পরমাণুতত্ত্ব

বোরই সর্বপ্রথম পরমাণুকেন্দ্রীণের বিভিন্ন কক্ষপথে ভ্রাম্যমান ইলেকট্রনের গুণাবলী সম্বন্ধে অনুসন্ধান করেছিলেন। রাদারফোর্ডের পরমাণু-মডেলকে ভিত্তি করে তিনি পরমাণুকেন্দ্রীণের চতুর্দিকে ইলেকট্রনদের ঘূর্ণ্যন সংক্রান্ত নিয়মাবলীর আবিষ্কার করলেন। বোরের ধারণা অনুযায়ী পরমাণুকেন্দ্রীণের বিভিন্ন কক্ষপথে ইলেকট্রন-বিন্যাস সম্পর্কে মোটামুটিভাবে একটি আলোচনা করা যেতে পারে।

সবচেয়ে সরল পরমাণু হলো হাইড্রোজেন, যার কেন্দ্রীণে রয়েছে একটি প্রোটন ও একটি কক্ষে ভ্রাম্যমান একটিমাত্র ইলেকট্রন। দু'টি বস্তুকণার তড়িৎশক্তি বিপরীতধর্মী হয়েও সমপরিমাণ, কাজেই পরমাণুটি তড়িৎব্যাপারে নিরপেক্ষ। কেন্দ্রীণের সবচেয়ে কাছের কক্ষপথটির নাম দেওয়া হয়েছে K। দ্বিতীয় আর একটি ইলেকট্রনের এখানে জায়গা হতে পারে। মেন্দেলিয়েভের মৌলিক পদার্থের পর্যায়িক ছকের (Periodic table of elements) দ্বিতীয় সদস্য হলো হিলিয়াম, যার পরমাণুর কেন্দ্রীণে আছে দু'টি প্রোটন আর K কক্ষপথে আছে দু'টি ইলেকট্রন। কেন্দ্রীণের সবচেয়ে কাছাকাছি থাকার জন্যে প্রথম কক্ষপথে ভ্রাম্যমাণ একটি বা একাধিক ইলেকট্রনের ওপর কেন্দ্রীণের আকর্ষণের জোরটাও হয় সবচেয়ে বেশি। অতএব সেই ইলেকট্রনদের কক্ষচ্যুত করবার প্রয়োজন দেখা দিলে বাইরে থেকে অনেক বেশি শক্তি প্রয়োগ করতে হবে। প্রথম কক্ষপথে ভ্রাম্যমাণ ইলেকট্রনের নিজস্ব শক্তির পরিমাণ আবার সবচেয়ে কম।

পর্যায়িক ছকের তৃতীয় সদস্য হলো লিথিয়াম। এর কেন্দ্রীনে তিনটি প্রোটন। কক্ষপথে ইলেকট্রন সংখ্যাও হবে তিনটি। দু-টি স্থান পাবে K কক্ষপথে, তৃতীয়টি স্থান পাবে একটি নতুন কক্ষপথে—যার নাম দেওয়া

হয়েছে L। এই কক্ষপথে আটটি ইলেকট্রনের জায়গা হতে পারে। বাইরের কক্ষপথে ইলেক্ট্রন সংখ্যা নির্দিষ্ট অঙ্কে না পৌছালে সমগ্র পরমাণুটি অস্থায়ী হতে বাধ্য। অর্থাৎ সেই অবস্থায় বহির্কক্ষে ইলেকট্রনদের ওপর কেন্দ্রীণের আকর্ষণের জোরটা শিথিল হয়ে পড়ে এবং তার সুযোগ নিয়ে দু-একটি ইলেকট্রন প্রতিবেশী অন্য কোনো পরমাণুর ঘরের ভেতর ঢুকে দু-টি স্বাধীন পরমাণুর জায়গায় একটি যৌগিক পরমাণুকে জন্ম দিয়ে বসে। ইলেকট্রনদের সংখ্যার ওপরেই পরমাণুর রাসায়নিক গুণাবলী নির্ভর করে বলে পরমাণুর অস্থায়ী অবস্থায় ইলেকট্রনদের ঘর বদলের ভেতর দিয়ে ভিন্ন রাসায়নিক গুণযুক্ত নানাবিধ যৌগিক পরমাণু ও যৌগিক পদার্থের সৃষ্টি সম্ভব হচ্ছে। K-র তুলনায় L-কক্ষপথে ভ্রাম্যমাণ ইলেকট্রনদের শক্তির পরিমাণ বেশি হয়ে থাকে।

হিলিয়াম রাসায়নিক ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন, কারণ হিলিয়াম পরমাণুর একটিমাত্র কক্ষপথ K-এর দু'টি ইলেকট্রনের চাহিদা স্বাভাবিকভাবেই মেটানো রয়েছে। পর্যায়িক ছকের তিন থেকে নয় নম্বর পর্যন্ত সব পদার্থগুলিই অস্থায়ী, কিন্তু দশ নম্বর নিয়ন্ কিন্তু স্থায়ী। কারণ, তার দ্বিতীয় কক্ষপথ L-এর চাহিদা অনুযায়ী আটটি ইলেকট্রনই গোড়া থেকে রয়েছে, যেটা আর অন্যদের ভাগ্যে জোটে নি। এগারো নম্বর পদার্থ সোডিয়াম পরমাণুর কেন্দ্রীণে ১১টি প্রোটন ; কেন্দ্রীণের চতুর্দিকে ভ্রাম্যমাণ এগারোটি ইলেকট্রনের দশটির জায়গা হয়েছে K এবং L কক্ষপথে এবং শেষেরটির জন্যে রয়েছে তৃতীয় একটি কক্ষপথ M। দূরত্বহেতু বহির্কক্ষের ইলেকট্রন কণার ওপর কেন্দ্রীণের আকর্ষণের জোর কম ও ঐ কক্ষপথের চাহিদার তুলনায় ইলেকট্রন সংখ্যা স্বল্প বলে এটিও অস্থায়ী। L-এর তুলনায় M কক্ষপথে ভ্রাম্যমাণ ইলেকট্রনদের নিজস্ব শক্তির পরিমাণ আবার সব সময়েই খানিকটা বেশি। এভাবে বিভিন্ন পরমাণুর কেন্দ্রীণের চতুর্দিকে সংখ্যায় আরো বেশি কক্ষপথের পরিকল্পনা করা হয়েছে বোরের বিশ্লেষণ অনুযায়ী।

একটি স্বাভাবিক পরমাণুকে বাইরে থেকে হঠাৎ একটি বড়ো শক্তি দিয়ে যদি আঘাত করা যায়, তাহলে তার কেন্দ্রীণের বহির্কক্ষের ভ্রাম্যমাণ একটি বা দু'টি ইলেকট্রনের ছিটকে বেরিয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে। সে অবস্থায় তড়িৎ নিরপেক্ষতা ক্ষুণ্ণ হয়ে পরমাণুটি ধনাত্মক অবস্থা লাভ করে বসবে, যার নাম দেওয়া হয়েছে ধনাত্মক আয়ন। কিন্তু বাইরে থেকে আঘাতকারী শক্তি যদি

তুলনায় সামান্য দুর্বল হয়, তাহলে আর একটি ঘটনা ঘটতে পারে। পরমাণু-কেন্দ্রীণের K-কক্ষপথের একটি ইলেকট্রন পরমাণুরাজত্বের বাইরে চালান না হয়ে L বা M বা অন্য কোনো কক্ষপথে গিয়ে হঠাৎ জায়গা জুড়ে বসতে পারে। সে অবস্থায় বাইরের কক্ষপথের বাড়তি শক্তিটুকু তার ঘাড়ে চেপে বসবে ও সমগ্র পরমাণুটি একটি উত্তেজিত অবস্থায় গিয়ে পৌছবে।

এই উত্তেজিত পরমাণুটির ঝোঁক হচ্ছে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে যাওয়া। সেটা কিভাবে সম্ভব? বাড়তি শক্তিটুকুই বা কোথায় যাবে? পরমাণু-সংক্রান্ত সমস্যাবলীর সমাধান ক্ল্যাসিকাল পদার্থবিজ্ঞানের গণ্ডিতে সম্ভব হয়ে উঠছিল না। ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক ১৯০৪ সালে Quantum theory বা কণাবাদ আবিষ্কার করেছিলেন। এই তত্ত্ব অনুযায়ী পরমাণুর বিকীরণ সৃষ্টি বা শোষণরূপ প্রক্রিয়া অবিচ্ছিন্ন ধারায় ঘটে না। বোর এই তত্ত্বকে পরমাণুর গঠনসংক্রান্ত বিষয়ে প্রয়োগ করে দু-টি অসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে পৌছলেন। প্রথমটির বক্তব্য হলো, কোনো পরমাণুর ইলেকট্রনেরা যখন তাদের আপন শক্তির মাপ অনুযায়ী নির্দিষ্ট কক্ষপথে বিরাজ করে, একমাত্র তখনই পরমাণুটি একটি স্থায়ী, বিকীরণবিহীনরূপে অবস্থান করতে পারে। দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরমাণু-কেন্দ্রীণের চতুর্দিকে ঘূর্ণ্যমান কোনো ইলেকট্রন যদি তার স্থায়ী কক্ষপথ ছেড়ে অন্য কোনো কক্ষপথে পৌছয় তাহলে পরমাণুটির সমগ্র শক্তিব্যবস্থায় পরিবর্তন ঘটবে। যদি এই স্থান পরিবর্তন ঘটে ভেতরের কক্ষপথ থেকে বাইরের কক্ষপথে, তাহলে হবে শক্তির অবশোষণ; আবার তা যদি ঘটে বাইরে থেকে ভেতরের কক্ষপথে, তাহলে হবে শক্তির বিকীরণ।

বোরের সিদ্ধান্ত পারমাণবিক পদার্থবিজ্ঞানজগতে এক নতুন দিগন্তকে উন্মুক্ত করে দিল। তাঁর বৈজ্ঞানিক অবদান আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতি পেল ১৯২২ সালে। ঐ বছর বোর পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার লাভ করলেন।

১৯২০ সালে বোর কোপেনহাগেনে 'ইনষ্টিটিউট অফ থিওরেটিক্যাল ফিজিক্স' নামে এক বৈজ্ঞানিক গবেষণামন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। স্বল্পকালের মধ্যেই এই কেন্দ্রটি সমগ্র পৃথিবীর বিজ্ঞানীকুলের এক মহাতীর্থক্ষেত্র হয়ে দাঁড়ায়। আমাদের ভারতের বিজ্ঞানী হোমি ভাবা কিছুকাল এখানে গবেষণাকার্যে লিপ্ত ছিলেন।

শিক্ষক ও মানুষ

১৯৩৩ সালে জার্মানিতে ফ্যাসিজমের উদ্ভব হয়। হিটলারী শাসনে ইওরোপের বিভিন্ন দেশের ইহুদী বিজ্ঞানীরা নিপীড়িত হতে থাকেন। নীল্স্ বোর এঁদের প্রত্যেকের কাছে সাদর আমন্ত্রণ জানালেন, তাঁর ইনষ্টিটিউটে অতিথি হবার জন্যে। ফ্যাসিস্ট-নিপীড়িত ইওরোপের শ্বাসরোধকারী পরিবেশ থেকে বিজ্ঞানীরা কোপেনহাগেনে এসে একদিকে যেমন পেলেন পরমাত্মীয়ের অভ্যর্থনা, তেমনি লাভ করলেন গবেষণার এক স্নিগ্ধ শান্ত পরিবেশ।

তাঁর ছাত্রদের কাছে বোর ছিলেন এক মহৎ প্রেরণাস্বরূপ। দাম্ভিকতা বা কর্তৃত্বের কোনো মনোভাবই তাঁর ছিল না। তাঁর বৈজ্ঞানিক কোনো ধারণা সম্বন্ধে কোনো ছাত্র তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করলেও তিনি কিছুমাত্র অসন্তুষ্ট হতেন না। শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে এ ধরনের মধুর সম্পর্ক বোধহয় একমাত্র সক্রেটিসের ক্ষেত্রেই সম্ভব হয়েছিল।

বোর জানতেন কিভাবে তাঁর ছাত্রদের সুপ্ত প্রতিভাকে বাস্তবে রূপায়িত করে তোলা যায়। তাঁর ইনষ্টিটিউটে কয়েক বছর গবেষণার পর একজন সত্যিই ভাবতে পারতেন, পদার্থবিজ্ঞান জগতে এমন কিছু মুক্তোর সন্ধান তিনি পেয়েছেন, যা তিনি আগে জানতেন না বা পৃথিবীর কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে বা অন্য কোথাও যা জানবার সুযোগ হয়তো তার মিলত না। বর্তমান পৃথিবীর বহু শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী কোনো না কোনো সময়ে বোরের অধীনে তাঁর ইনষ্টিটিউটে গবেষণাকার্যে লিপ্ত ছিলেন।

ডেনমার্কের গভর্নমেন্ট দেশের সবচেয়ে জ্ঞানী মানুষটির প্রতি তাঁদের অন্তরের শ্রদ্ধার প্রতীকস্বরূপ কোপেনহাগেনের বিখ্যাত কার্লসবাগ প্রাসাদটি বোরের বাসভবনরূপে নির্বাচিত করে দিয়েছিলেন। বোর রোজ সাইকেলে চেপে ইনষ্টিটিউট-এর পথে বেড়োতেন। চৌমাথার মোড়ে লাল আলোর সংকেতের দিকে কদাচিৎ তাঁর নজর পড়ত। আবার যখন ট্রামের যাত্রী হতেন, এমন গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে পড়তেন যে ইনষ্টিটিউটের ষ্টপ ছাড়িয়ে একেবারে টার্মিনাসে পৌছে যেতেন। ফেরার সময়েও প্রায়ই নির্দিষ্ট জায়গায় নামার কথা মনে থাকত না। এমনই ভুলো মন ছিল মানুষটির। কিন্তু বোর শুধু যে পড়াশুনো বা গবেষণা নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন, তা মোটেই নয়। তিনি ছাত্রদের সঙ্গে নদীতে নৌকো বাইতে বেরিয়ে পড়তেন, তাদের সঙ্গে

হাওয়াকল তৈরির কাজে লেগে যেতেন আর পিং-পং খেলার ব্যাপারেও তাঁর ছিল ভয়ানক উৎসাহ।

বোরের অবশ্য সবচেয়ে প্রিয় খেলা ছিল ফুটবল এবং ভালো খেলোয়াড় হিসেবে তাঁর বেশ নামও ছিল। বোরের ফুটবল খেলার ব্যাপারে বেশ একটি মজার কথা চালু আছে। বিপক্ষের গোলে বল কিক্ করতে ভুলে গিয়ে বোর কখনও কখনও খেলার মধ্যেই বলটাকে হঠাৎ হাতে তুলে নিয়ে দেখবার চেষ্টা করতেন, সেই চামড়ার বস্তুটির মধ্যে আসলে কী থাকতে পারে।

বোর ও পরমাণু বোমা

১৯৩৬ সালে বোর পরমাণুকেন্দ্রীণে ক্রিয়াপ্রক্রিয়া সম্বন্ধে একটি নতুন তত্ত্ব আবিষ্কার করলেন। ১৯৩৯ সালে বোর নিউইয়র্কে এলেন, আইনস্টাইন ও অন্য বিজ্ঞানীদের সঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা করবার জন্যে। বিষয়টি ছিল—পরমাণুর বিভাজন সংক্রান্ত বোরের তত্ত্ব। বোরের ইনষ্টিটিউটে জার্মান মহিলা বিজ্ঞানী লিজে মাইটনার ও তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র ফ্রিশ্ খের গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছিল যে ইউরেনিয়াম ধাতুর জুড়িদার (isotope) ইউ-২৩৫-এর পরমাণুকেন্দ্রীণকে একটি নিউট্রন দিয়ে আঘাত করলেই পরমাণুটি প্রায় দু'টি সমান ভাগে ভেঙে যায়।

পরবর্তী কয়েকটি সপ্তাহ আমেরিকার বিভিন্ন গবেষণাগারে ক্রমিক পরীক্ষাকাজের ভেতর দিয়ে বোরের এই তত্ত্ব যে অভ্রান্ত, তার প্রমাণ মিলল। বিজ্ঞানীদের মাঝে একটি চাপা উত্তেজনার ভাব পরিলক্ষিত হলো। কারণ এই ঘটনার মধ্যে যে নির্দেশ মিলছে, তা হলো এই— পরমাণুর আভ্যন্তরীণ শক্তিকে নির্গত করা সম্ভব এবং ইউরেনিয়াম বিভাজনের মাধ্যমে হয়তো সেই মহাশক্তিমান আয়ুধ পারমাণবিক বোমাকে একদিন তৈরি করে তোলা যাবে।

বোর ডেনমার্কে ফিরে এলেন। ইওরোপ মহাদেশে তখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হয়েছে। ইংলণ্ড ও আমেরিকা থেকে বার বার তাঁর কাছে আবেদন এসে পৌছচ্ছিল স্বদেশভূমি ত্যাগ করার জন্যে। ডেনমার্ক জার্মানরা তখন দখল করে নিয়েছে। কিন্তু বোর তাঁর ইনষ্টিটিউটকে রক্ষার জন্যে স্থির করলেন, যতদিন সম্ভব তিনি দেশেই থাকবেন। ১৯৪৩ সালে পরিস্থিতি যখন খুব সঙ্গীন হয়ে দাঁড়াল, বোর একটা মাছধরা নৌকোয় চেপে ডেনমার্ক থেকে পালিয়ে এলেন স্থইডেনে। সেখান থেকে একটি মসকুইটো বোমারু বিমানে

বোর উত্তর সাগরের ওপর দিয়ে ইংলণ্ড রওনা হলেন। তাঁকে বসানো হয়েছিল ঠিক যে জায়গা দিয়ে নিচে বোমা ফেলা হয়, তারই ওপরে। উদ্দেশ্যটা ছিল এই, যদি কোনো কারণে জার্মান ফাইটার বিমানগুলো এসে ছেঁকে ধরে এবং পালিয়ে যাবার আর কোনো উপায়ই না থাকে, তাহলে একটি হাতল ঘুরিয়ে বোরকে সোজা সমুদ্রের জলে ফেলে দেওয়া হবে। এই দামী মালটি শত্রুর হাতে পড়ার চেয়ে বরং খোয়া যাওয়াই ভালো। বিমানটি প্রায় দু'হাজার ফুট ওপরে ওঠবার সময় পাইলট বোরকে জানালেন, অক্সিজেন মুখোস পরবার জন্যে। বোর তখন হয়তো পদার্থবিজ্ঞানের কোনো সমস্যায় এমনই আত্মমগ্ন হয়ে ছিলেন যে পাইলটের কোনো কথাই তার কানে গিয়ে পৌছোয়নি। কাজেই বিমানটি ওপরে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই বোর মূর্ছিত হয়ে পড়লেন এবং লণ্ডনে এসে যখন পৌছলেন তখন তাঁর শারীরিক অবস্থা খুবই শোচনীয়।

বোর যখন ইংলণ্ড থেকে আমেরিকায় এসে পৌছন, তখন সেখানে পরমাণু বোমার গবেষণা চূড়ান্ত পর্যায়ে শুরু হয়ে গেছে। বোর নিজেও গভীরভাবে সে কাজে জড়িয়ে পড়লেন।

মানবতার মহৎ মূর্তি

পরমাণুবোমার গবেষণায় অন্যান্য অনেক বিজ্ঞানীর মতো নীল্স্ বোরও সাগ্রহে যোগ দিয়েছিলেন শুধু এই আশঙ্কায়, পাছে হিটলারের অধীনে জার্মান বিজ্ঞানীরা পরমাণুবোমা আবিষ্কার করে তাকে মানবসভ্যতা ধ্বংসের কাজে নিয়োগ করে বসে। ১৯৪৪ সালের গোড়া থেকেই বোর বিশেষভাবে চিন্তা করছিলেন, পরমাণুর আভ্যন্তরীণ প্রচণ্ড শক্তির আবিষ্কারের ফলে ভবিষ্যতে জটিল কোনো রাজনৈতিক সমস্যার উদ্ভব হতে পারে কিনা। জার্মানির সঙ্গে যুদ্ধরত মিত্রপক্ষের তিনটি বৃহৎ রাষ্ট্র—আমেরিকা, ইংলণ্ড ও সোভিয়েত রাশিয়ার মধ্যে বন্ধুত্ব ও মৈত্রী যুদ্ধের পরেও আগের মতোই বজায় থাকবে এ জোরালো বিশ্বাস বোর মনে মনে পোষণ করে উঠতে পারছিলেন না। তাই তিনি চেয়েছিলেন, পরমাণুবোমা আবিষ্কার বা যুদ্ধে তার প্রয়োগ হবার আগেই পারমাণবিক শক্তির সমগ্র প্রয়োগব্যবস্থায় আমেরিকা, ব্রিটেন ও রাশিয়ার যৌথ নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হোক।

আগামী ভবিষ্যতে সমগ্র মানবজাতির সামনে যে প্রশ্নগুলো জীবন ও মৃত্যুর

মতোই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দেখা দিতে পারে, সেগুলো একটি বিবৃতির মাধ্যমে বোর রুজভেল্ট ও চার্চিলের কাছে ১৯৪৪-এর তেসরা জুলাই পাঠিয়েছিলেন। এ বিষয়ে আলোচনার জন্যে বোর ঐ বছরের ছাব্বিশে আগস্ট আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের সঙ্গে দেখাও করেছিলেন। তাঁর লিখিত বিবৃতিতে বোর এ কথাটাই বোঝাতে চেয়েছিলেন যে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংগঠনের বিচারে সম্পূর্ণ দুটি বিরুদ্ধ মতাবলম্বী সংস্থা হলেও সোভিয়েত রাশিয়া এবং তার মিত্রশক্তিদের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাবুঝির ব্যাপারে পারমাণবিক শক্তির আবিষ্কার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। তিনি প্রস্তাব করেছিলেন, প্রাথমিকভাবে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠার জন্যে বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানীদের মধ্যে যে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক রয়েছে, তাকে কার্যে নিয়োগ করা উচিত। বোর স্বপ্ন দেখেছিলেন, পারমাণবিক বিজ্ঞানীদের সম্মিলিত একটি পরিবার সৃষ্টির ভেতর দিয়েই ভবিষ্যতে এক মহৎ পরিবার গড়ে উঠবে—পৃথিবীর সমগ্র রাষ্ট্র হবে যে পরিবারের সদস্যভুক্ত।

মহাবিজ্ঞানী নীলস্ বোরের ঐ বিবৃতিটি চিরকালের জন্যে ইতিহাসে এক সুমহৎ মানবিক দলিলের মর্যাদা লাভ করবে।

যুদ্ধের পর বোর স্বদেশে ফিরে এসে আবার তাঁর ইনষ্টিটিউটের কার্যভার গ্রহণ করলেন।

১৯৫০ সালে বোর জাতিসঙ্ঘের কাছে আবেদন করেছিলেন, যাতে পারমাণবিক শক্তিসংক্রান্ত তথ্যের আদানপ্রদানের ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক উত্তেজনা প্রশমনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

১৯৫৪ সালে আমেরিকায় আগমন উপলক্ষে বোর বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়ে যে কথাটি বলেছিলেন, তা ছিল এই যে, পারমাণবিক শক্তিকে মানুষের কল্যাণমূলক কাজে প্রয়োগের উদ্দেশ্যে জাতিতে জাতিতে সহযোগিতার ভিত্তি প্রতিষ্ঠার মধ্যেই নিহিত রয়েছে মানবজাতির ভবিষ্যৎ।

১৯৫৫ সালে জেনিভায় পারমাণবিক শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহার বা 'Atom for Peace' নামে যে আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, নীল্স্ বোর ছিলেন তার প্রধানতম উদ্যোক্তা। পৃথিবীর ষাটটি দেশের প্রতিনিধি এই সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন। সমগ্র পৃথিবীর বিজ্ঞানীসমাজের মধ্যে যে সহযোগিতার বাণী ঐ মহতী সভা থেকে প্রচারিত হয়েছিল, তা সত্যিই অভূতপূর্ব।

জাতিতে জাতিতে বিদ্বেষমুক্ত সুখী মানবসমাজ যেদিন প্রতিষ্ঠিত হবে, সেদিন মানুষ আবার নতুন করে স্মরণ করবে মানবপ্রেমিক মহাবিজ্ঞানী নীল্স্ বোরকে—যিনি একদিন স্বপ্ন দেখেছিলেন ঐ সুখী ভবিষ্যতের।

শঙ্কর চক্রবর্তী

সাম্প্রতিক চিত্র-প্রদর্শনী প্রসঙ্গ

শীত-ঋতুতে কলকাতায় চিত্রকলার প্রদর্শনী এখন আর নতুন ঘটনা নয়। বরং বলা যায়, চিত্র-প্রদর্শনী অধুনা আর শীত-গ্রীষ্মের সীমানা মানছে না। কি বসন্ত কি শরৎ—এখন বারো মাসই কলকাতায় চিত্র-প্রদর্শনীর আয়োজন চলতে থাকে। সংখ্যাতত্ত্বের দিক থেকে এটা নিশ্চয় অগ্রগতির চিহ্ন। কিন্তু এ-সব সত্ত্বেও শীত-ঋতু এখনো প্রদর্শনীর শ্রেষ্ঠতম সময়রূপে শিল্পীমহলে বিবেচিত। ফলে, পরিমাণগত এবং গুণগত উভয় দিক থেকে এই সময় কলকাতার শিল্পরসিক মানুষ সাম্প্রতিক চিত্রকলার গতি-প্রকৃতি অনুধাবন করার সুযোগ পেয়ে থাকেন। আমরাও গত একমাসে যে-সব চিত্র-প্রদর্শনী দেখার সুযোগ পেয়েছি তার একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা তুলে ধরতে চেষ্টা করছি।

গত একমাসের সম্মিলিত ও একক প্রদর্শনীতে একটি লক্ষণ খুব স্পষ্ট। বাংলা দেশের তরুণ শিল্পীরা আধুনিক ইওরোপীয় শিল্প-আঙ্গিককে অত্যন্ত দ্রুত আত্মসাৎ করার চেষ্টা করছেন। এমনকি সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে যে-সব শিল্পী আধুনিক রীতি-পদ্ধতির অনুসারী এবং খ্যাতিমান, তাঁদের অনুসরণকারী তরুণ শিল্পীর সংখ্যাও বাংলা দেশে কম নয়। এই অনুসরণকারীর মধ্যে যাঁরা অপেক্ষাকৃত দুর্বল শিল্পী তাঁদের রচনায় অনুকরণের ঝোঁকও বিদ্যমান। এঁরা বাদে আরো কিছু উগ্র আধুনিকপন্থী শিল্পীর চিত্র-নিদর্শনের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষিত হয়েছে। এঁরা বিমূর্ততার পূজারী। কিন্তু এই বিমূর্ততার নামে অনেকে যে উন্মার্গগামী হয়েছেন—এমন দৃষ্টান্তও দৃষ্টিগোচর হয়েছে। এই আধুনিক শিল্পরীতির পাশাপাশি চলছে প্রথাসিদ্ধ কিংবা অ্যাকাডেমিক পদ্ধতির চিত্র-রচনার কাজ। শুদ্ধ ভারতীয় পদ্ধতি কিংবা লোকশিল্পের আঙ্গিকে রচিত চিত্র-কর্মের নিদর্শন প্রায় বিরল হয়ে আসছে। বাঙলার তরুণ শিল্পীদের আঙ্গিকগত পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে এই প্রবণতাগুলিই প্রধান।

আর্ট কলেজের চিত্র-প্রদর্শনী

শুধু তরুণ শিল্পীরাই নন, কলকাতার দুটি আর্ট কলেজের ছাত্র-শিল্পীরাও এই লক্ষণাক্রান্ত। এবার চৌরঙ্গীর আর্ট কলেজ এবং ধর্মতলার ইণ্ডিয়ান আর্ট কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের সম্মিলিত প্রদর্শনীতে নানা রীতির, নানা পদ্ধতির মধ্যেও উপর্যুক্ত চেতনার প্রকাশ লক্ষ্য করা গেছে। এটা ভালো

কি মন্দ সে-কথা তর্ক-সাপেক্ষ। কিন্তু অ্যাকাডেমিক বিধিনিষেধের বন্ধন যে বর্তমানে অনেকখানি শিথিল এ-কথা বুঝতে কষ্ট হয় না। কুমকুম মুন্সী, মধুসূদন কুশারী, দীপশ্রী গোস্বামী, অঞ্জু দেব, কৌশিক চক্রবর্তী, নিরঞ্জন প্রধান, কুণাল কিশোর কর, বিকাশ ভট্টাচার্য, পাঁচু গুপ্ত, অঞ্জু চৌধুরী, শর্বানী কর, কমল চৌধুরী প্রভৃতি তেল-রঙ ও জল-রঙের মাধ্যমে অঙ্কিত চিত্রে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিয়েছেন। সামগ্রিক বিচারে বলা যায়, তেল-রঙের কাজে সরকারী আর্ট কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা যেমন কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন তেমনি বে-সরকারী ইণ্ডিয়ান আর্ট কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরাও নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছেন জল-রঙের মাধ্যমে অঙ্কিত চিত্র-রচনার কাজে। ভাস্কর্য ও বাণিজ্যিক শিল্প-চর্চাতেও বে-সরকারী আর্ট কলেজ সরকারী আর্ট কলেজের চেয়ে উন্নততর শিল্প-রুচির পরিচয় দিয়েছেন।

সোসাইটি অফ ওরিয়েন্টাল আর্ট-এর প্রদর্শনী

সম্মিলিত চিত্র-প্রদর্শনীর মধ্যে একটি প্রদর্শনী তথাকথিত আধুনিক পন্থার ব্যতিক্রমস্বরূপে কলকাতার শিল্পরসিক মানুষদের কাছে অভিনন্দিত হয়েছে। এটির উদ্যোক্তা সোসাইটি অফ ওরিয়েন্টাল আর্ট। ভারতীয় শিল্পচর্চার ইতিহাসে এই নামটি শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারিত হলেও দীর্ঘকাল এই সংস্থার কোনো কার্যকলাপ আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়নি। ফলত অবনীন্দ্রনাথের স্মৃতি-বিজড়িত এই সংস্থার কথা আমরা প্রায় ভুলতে বসেছিলাম। এই অবস্থায় ভারতীয় ঐতিহ্যময় ধারাকে এঁরা দর্শকের সম্মুখে উপস্থিত করায় আমরা খুশি হয়েছি।

এই প্রদর্শনীতে পনেরো জন প্রধান ও নবীন শিল্পীর ৮১খানি চিত্র-নিদর্শন স্থান পেয়েছিল। কোনো চিত্রেই আঙ্গিক-প্রকরণে আধুনিকতার চিহ্ন ছিল না। বরং জলরঙ ও টেম্পেরার মাধ্যমে অঙ্কিত নিসর্গ দৃশ্যগুলির বিন্যাসে এবং মৃদু রঙ প্রয়োগ পদ্ধতির মধ্যে ছিল প্রথাসিদ্ধ ভারতীয় পদ্ধতির অনুসরণ। এই সব চিত্রের মধ্যে গোপেন রায়ের 'প্রভাতসূর্য' 'বিদায়লগ্ন' কিংবা মনোরঞ্জন সাহার নিসর্গ চিত্রাবলী নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য। এ-ছাড়া শ্রীমতী বীথি ঘোষ, প্রভাত গঙ্গোপাধ্যায় এবং নীরেন ঘোষের কয়েকখানি চিত্রও আমাদের ভালো লেগেছে। মোগল-রীতিতে অঙ্কিত তুফান রাফাইয়ের টেম্পারার কাজ 'ঘুড়ি ওড়ানো' ও 'শোভাযাত্রা'—চিত্র-সংস্থাপনের গুণে সুন্দর। তেল-রঙের মাধ্যমে অঙ্কিত

শ্রীমতী বীথি ঘোষ, করুণা সাহা এবং আশীষ প্রধানের নিসর্গ দৃশ্যের মনোরম বর্ণ-বিন্যাস এবং চিত্রের ঘনত্ব ও দূরত্ববোধক সংস্থাপন সত্যি প্রশংসার যোগ্য। মুরলীধর টালির প্রতিকৃতি-চিত্র 'আমার মা' একটি স্মরণীয় সৃষ্টি। লোকশিল্প এবং বিশুদ্ধ ভারতীয় পদ্ধতিতে অঙ্কিত চিত্রগুলির মধ্যে শিল্পী কেশব ভৌমিক, শ্রীমতী মায়া রায় এবং অর্ধেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় যথেষ্ট নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন।

দুটি বিমূর্ত চিত্র-প্রদর্শনী

এই সম্মিলিত প্রদর্শনীর চেয়ে একক প্রদর্শনীর সংখ্যা অনেক বেশি। একক প্রদর্শনীগুলিতেই আধুনিক এবং বিমূর্ত শিল্প-চেতনার প্রকাশ ঘটেছে উগ্রভাবে। এইমাসে বিমূর্ত শিল্প-চেতনার উগ্রতর রূপের জন্য শিল্পী বিমল বন্দ্যোপাধ্যায় এবং চিন্ময় চৌধুরীকে আমরা চিহ্নিত করতে পারি। অবশ্য বাস্তবধর্মী শিল্পী থেকে বিমল বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই হঠাৎ বিমূর্তবাদী হওয়া কতখানি স্বাভাবিক পরিণতি কিংবা কতখানি অনুকরণ-প্রিয়তার পরিচয় তা বিচার করা দুঃসাধ্য। তবে এইটুকু বুঝেছি, শুধুমাত্র এলোমেলো রঙ প্রয়োগে একটি প্যাটার্ণ সৃষ্টি করে বিমলবাবু আমাদের যা উপহার দিয়েছেন তার মধ্যে বিশেষ কোনো বক্তব্য বা শিল্প-সৌন্দর্য নেই, আছে স্টান্টধর্মী মনোভাব। এবং এ-মনোভাব পরিত্যাজ্য। চিন্ময় চৌধুরীর দুর্বল ড্রয়িংকে মনোরম রঙে ঢাকার কৃতিত্ব অবশ্যই স্বীকার্য। শুধু তাই নয়, চিন্ময়বাবু নর-নারীর চেতনা-প্রবাহকে বর্ণাঢ্য রঙের প্রলেপে এবং চিত্র-সংস্থাপনের চমৎকার কৌশলে কোনো কোনো চিত্রে সার্থকভাবে প্রকাশ করতে পেরেছেন। ফলে, তাঁর বিমূর্ত-চেতনা থেকে আমরা বাস্তবকে কিঞ্চিৎ স্পর্শ করতে পেরেছি। আশা করি এঁরা উভয়েই ভবিষ্যতে বিমূর্ত চিত্ররচনার জন্য আরো নিষ্ঠা ও সততার পরিচয় দেবেন।

বাস্তবধর্মী চিত্র-প্রদর্শনী

এরই পাশাপাশি কবি-শিল্পী দিলীপ রায়ের বাস্তবানুসারী নির্বাচিত চিত্রকলার একটি একক প্রদর্শনী বিমূর্ত শিল্প-চেতনার বলিষ্ঠ প্রতিবাদ হিসাবে উল্লেখ্য। এতকাল দিলীপ রায়ের চিত্র-প্রদর্শনীর ভিড়ের মধ্যে তাঁর সত্যিকার সৌন্দর্য-পিপাসু মনকে খুঁজে পেতে অনেক দর্শকেরই কষ্ট করতে হয়েছে। এই নির্বাচিত চিত্রগুলি সেদিক থেকে এবার দিলীপবাবুর শিল্পী-মনকে বুঝতে সাহায্য করেছে। তাঁর ফুলের স্টাডিগুলি সুন্দর। পাখি কিংবা জীবজন্তর

স্টাডিগুলির মধ্যেও বলিষ্ঠ রেখা, রঙ এবং চিত্র-সংস্থাপনের কৌশল তাঁর নৈপুণ্যের পরিচায়ক। তাঁর চিত্রের মধ্যে এমন একটি স্নিগ্ধ-সৌন্দর্য-চেতনা এবং মুড প্রকাশিত যা সহজ সরল অথচ প্রাণবন্ত। 'জনতা' এবং অন্য কয়েকখানি চিত্রে অবশ্য তিনি বিমূর্ত শিল্প-আঙ্গিক নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। কিন্তু তাঁর এই বিমূর্ততা বাস্তব-বিচ্ছিন্ন নয় বলেই আমাদের ভালো লেগেছে।

মধ্যপন্থী অথচ বলিষ্ঠ দুটি চিত্র-প্রদর্শনী

বিমূর্ত ও বাস্তবধর্মী চিত্রের দুই মেরুবিন্দুতে অবস্থান না করেও যে-দুজন তরুণ শিল্পী উল্লেখযোগ্য শিল্প-কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন তাঁরা হলেন শিল্পী নিখিল বিশ্বাস ও বিজন চৌধুরী। এঁরা মনে-প্রাণে আধুনিক। শিল্পী নিখিল বিশ্বাসের চিত্রে বলিষ্ঠ রেখায় এক গতিময় আবেগ প্রতিফলিত। তাঁর রৈখিক চেতনাকে প্রকাশ করার জন্যই তিনি ধাবমান 'অশ্ব' কিংবা 'যুদ্ধ'-কে চিত্রের বিষয়বস্তুরূপে গ্রহণ করেছেন। অশ্বের গতিময়তা এবং সৈনিকের বলিষ্ঠ পেশী ও উদ্দামতার মধ্যে শিল্পী রঙে আর রেখায় এমন ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করেছেন যার আবেদন সহজগ্রাহ্য। তাঁর 'অশ্ব' 'খনিশ্রমিক' কিংবা যুদ্ধ সিরিজের ১১ খানি চিত্র নিঃসন্দেহে বিমূর্ততা ও বাস্তবতার সংমিশ্রণে গঠিত চমৎকার দৃষ্টান্ত। শিল্পী বিজন চৌধুরী আরও অগ্রসর হয়েছেন। তাঁর চিত্রের বিষয়বস্তু আহৃত হয়েছে কালীঘাটের কালীমন্দিরকে কেন্দ্র করে যে জীবন, তার মধ্য থেকে। সাধারণ মানুষের বিশেষ মুহূর্ত কিংবা লৌকিক উৎসবকে তিনি তেলরঙের মাধ্যমে দেহাবয়বের সামান্য বিকৃতি ঘটিয়ে কখনো হেলানো, কখনো লম্বমান ছন্দিত রেখায় সমগ্র চিত্রের জমিনে এমনভাবে বিন্যস্ত করেছেন যা লোক-শিল্পের কথা আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েও আধুনিক। কারণ, কিউবিজমের বিশেষ ভঙ্গির মধ্যেই তাঁর রেখা ও রঙ মূলত সঞ্চরণশীল। প্রখ্যাত শিল্পী নীরোদ মজুমদারেরই তিনি ভাব-শিষ্য। বিজনবাবুর 'মেলার-দৃশ্য', 'গাজন উৎসব', 'বাঁশি-বিক্রেতা' কিংবা 'এয়োতির চিহ্ন' সার্থক রচনা বলে স্বীকৃতি পাবে। চিত্রের জমিন সৃষ্টিতে তিনি অপূর্ব এক ম্যাটিং পদ্ধতি প্রয়োগ করেছেন। অথচ রঙের দিক থেকে তিনি মোটামুটি লাল, নীল, হলুদ, সবুজ ও ধূসর রঙ ব্যবহারের পক্ষপাতী। এই রঙগুলির প্রয়োগ কখনো কখনো মিশ্র রঙের এফেক্ট সৃষ্টি করেছে। এই দুই তরুণ শিল্পী সম্পর্কে আমরা আশা পোষণ করতে পারি।

গত এক মাসের চিত্র-প্রদর্শনীর এই ফলশ্রুতি দেখে বলা যায়, বিমূর্ত ও বাস্তবধর্মী চিত্রকলার ভাব-সংঘাতে বাঙলার শিল্পীমন আজ সংশয়াচ্ছন্ন। এর মধ্যে যাঁরা ভারসাম্য রক্ষা করে বলিষ্ঠভাবে অগ্রসর হতে পারবেন বিজয়ীর বরমালা তাঁদেরই প্রাপ্য। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বাঙলার তরুণ শিল্পীদের মধ্যে ভারসাম্যরক্ষাকারী শিল্পীর সংখ্যা একান্তই অঙ্গুলীমেয়।

ধনঞ্জয় দাশ

কলাকর্ম : বৎসরান্তিক ফসল

শীতের হাওয়ায় আর অনেক কিছুর মতোই কলকাতার সাংস্কৃতিক জীবনে জড়িয়ে আছে চিত্রপ্রদর্শনীর মরশুম। বৎসরান্তিক ফসল, শুধু বাংলা দেশেরই নয়, ভারত জুড়েই কী উঠলো শিল্প-আন্দোলনের জগতে—আমি চিত্রকর্ম ও ভাস্কর্যের কথাই বলছি—তার একটা রূপরেখা এ-সময় সাজিয়ে দিয়ে আসছেন আমাদের সামনে অনেক দিন থেকেই একাডেমি অব ফাইন আর্টস তাঁদের বার্ষিক প্রদর্শনীর মধ্য দিয়ে। এবারেও তার ব্যতয় হয় নি। যদিচ, এবারে এই প্রদর্শনী এসেছে শুধুই পঞ্চম ঋতুর হিমেল হাওয়ার আমেজ বয়ে নয়, এসেছে আজ যুদ্ধের ছায়ায়।

তবু, আমাকে একজন শিল্পী যেমন সেদিন বলছিলেন: দেশের এই আপৎকালীন অবস্থা সত্বেও জীবনের চাকা ঠিকই ঘুরবে। স্রষ্টার তুলি ঠিকই ক্যানভাসের ওপর তার রঙ চড়িয়ে যাবে; বা ছেনি-বাটালির ঘায়ে পাথরের বুকে ঠিকই জেগে উঠবে নতুনতর ভাস্কর্য।

আমি আরও একটু যোগ করে বলেছিলাম : বরং, বোধ হয়, এরকম সময়েই আরো বেশি করে জানান দিতে হবে আমাদের চিরাচরিত জীবনধারার মৌল মূল্যবোধগুলিকে, আমাদের সৃজনশীলতার উৎসমুখ আরো বেশি করে খুলে ধরার এই-ই সময়। কেন না, আজ আমাদের সামনে পরীক্ষা এসেছে।

একাডেমি অব ফাইন আর্টস বা যে কোনো চিত্র-প্রদশনী, শিল্পপ্রয়াস প্রভৃতির বর্ধিত আকর্ষণমূল্য এই মুহূর্তে বোধহয় তাই-ই।

একাডেমির এটি হলো ২৭তম বার্ষিক প্রদর্শনী। এবারের প্রদর্শনীতে ১৬৩ জন শিল্পীর ৩৭৮টি কাজ স্থান পেয়েছে। সংখ্যার দিক থেকে শিল্প-দ্রষ্টব্যের এই ব্যাপকতাও লক্ষ্যণীয়। আর শুধু, কলকাতা বা শান্তিনিকেতনের শিল্পীদের নয়, এবারের প্রদর্শনীর অংশগ্রহণকারী শিল্পীদের কাজ ভারতের

অন্যান্য রাজ্য—বোম্বাই, আমেদাবাদ, পুণা, দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, বেনারস, হায়দরাবাদ, বাঙ্গালোর, ইন্দোর, কটক, জয়পুর, ভবনগর, ভিজিয়ানাগ্রাম, রাজমণ্ড্রী, কাশ্মীর—এইসব অঞ্চলের শিল্পীগোষ্ঠীর কাছ থেকেও এসেছে। সব মিলিয়ে আজকের সমসাময়িক কলা আন্দোলনের একটি প্রতিনিধিত্বমূলক পরিচয় বহন করতে পেরেছে এই প্রদর্শনী ও যার মধ্যে খ্যাতনামা শিল্পীদের পাশাপাশি প্রতিশ্রুতিবান তরুণদের শিল্পকর্মও প্রদর্শনী গ্যালারীর দর্শকের অভিনিবেশ আকর্ষণ করতে পারে।

প্রদর্শনীর শিল্পদ্রষ্টব্যকে মোটামুটি ভাগ করা যায় চার ভাগে: সমসাময়িক চিত্রকলা—যাতে আধুনিক য়ুরোপীয় চিত্রকলার পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রভাবও কম বেশি থেকে যায়, ঐতিহ্যানুসারী ভারতীয় পদ্ধতির চিত্রাবলী, গ্রাফিক শিল্প ও ভাস্কর্য।

তুলনামূলকভাবে দেখতে গেলে সমসাময়িক চিত্রকলা বিভাগটিই এ-বৎসর প্রদর্শনীর অন্যান্য বিভাগের চেয়ে সমৃদ্ধতর মনে হবে, যদিও বিশিষ্ট কয়েকজনের অনুপস্থিতিও এতে লক্ষ্যণীয়। আচার্যস্থানীয় শ্রীযামিনী রায় ও শ্রীনন্দলাল বসুর কোনও কাজ যদিও আমরা এই প্রদর্শনীতে পাই না; কিন্তু শ্রীলক্ষ্মণ পাই, শ্রীসতীশ গুজরাল, শ্রীনীরোদ মজুমদার, শ্রীকানওয়াল কৃষ্ণ, শ্রীসুনীলমাধব সেন কিংবা শ্রীপি. টি. রেড্ডী আমাদের আনন্দ দিয়েছেন। শ্রীগুজরাল সম্পর্কে একটি কথা, তিনি কি তাঁর শিক্ষাগুরু বিখ্যাত মেক্সিকান শিল্পী স্কেকেরসের ধারা পরিত্যাগ করলেন, যে ধারা দখলে এনে তিনি অনেকগুলি বলিষ্ঠ কাজ আমাদের উপহার দিয়েছিলেন নিজস্ব প্রতিভার সংমিশ্রণে? এবারে তিনি যে কাজটি প্রদর্শনীতে দিয়েছেন, তাতে মনে হলো অন্যতর বৈদেশিক শিল্পরীতির প্রভাবে তার 'মহীপতি' কয়েকস্তর রঙের গোপন গূঢ় আড়াল থেকে মাঝে মাঝে উঁকি দিয়েই অপস্রিয়মান, অন্যদিকে শ্রীনীরোদ মজুমদারের বর্ণলেপনের ঠাসবুননির আর প্যাটার্নের মধ্য দিয়ে তাঁর হিন্দু প্রতীকী শিল্পধারা নিয়ে সাধনার সমাহিতি "দেবতাদের সঙ্গে গরুড়ের উড্ডয়নে" স্বপ্রকাশ হয়ে থাকে। শ্রীরথীন মৈত্র এবারের প্রদর্শনীতে যে তেলরঙের ছবিটি দিয়েছেন, সমসাময়িকত্ব শিল্পমানসে কি ভাবে কাজ করছে, সেটি তার প্রমাণ। রঙের বৈপরীত্যে তাঁর ছবিটিতে একটা ডানাখোলা দুরন্ত বাজপাখি আকাশ থেকে নেমে আসে ও দুইটি পায়ের নখরে একজোড়া শ্বেতকপোতকে নিহত করতে চায়। চৈনিক আক্রমণের মুখে শান্তি প্রতীক ছবিতে ফুটিয়ে তোলা

হয়েছে। এই বিভাগে আরও দৃষ্টি আকর্ষণ করে শ্রীপ্রেম রাভাল, অরুণা পুরোহিত, চন্দ্রেশ সাকসেনা, সামন্ত ভি. শাহ, সুবীর সেন, শ্রীসত্যেন ঘোষাল, শ্রীকে. এস কুলকারনি, গজেন্দ্র শাহ প্রমুখের কাজ। শ্রীদেবকুমার রায় চৌধুরীর 'অন্তরাগ' বর্ণিকাভঙ্গী ও উপস্থাপনে ম্যুরাল চিত্রের বিস্তৃতি পেয়েছে। সুকোমল শাসমল কি বিজন চৌধুরীও তাঁদের কাজে গতানুগতিকতা থেকে উত্তীর্ণ হয়ে যান।

খ্যাতনামাদের মধ্যে আর একজন শ্রীঅতুল বসু তাঁর তারুণ্য ও প্রৌঢ়ত্বের দুটি 'আত্মপ্রতিকৃতি' যা প্রদর্শনীতে দিয়েছেন, তা তাঁর প্রতিকৃতি চিত্রণে শক্তিমত্তারই পুনঃপ্রকাশ। 'আত্মপ্রতিকৃতি' দুটিতে ব্যক্তিত্ব এই বড় জিনিস। আর শান্তিনিকেতনের শ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সৌন্দর্য-স্নিগ্ধ কাজটি ('সপুষ্পা'—যার অনুলিপি এই 'পরিচয়'-এর গত সংখ্যাতে প্রকাশিত হয়েছে), আবার আমাদের স্মরণে এনে দেয় সমসাময়িক ভারতীয় চিত্রকলার জগতে এই ট্রাজেডীর কথা যে, এই একজন অসাধারণ শিল্পী আজ তাঁর দুই চোখের দৃষ্টিশক্তি সম্পূর্ণ হারিয়েছেন। শ্রীসতীশ সিংহের তেলরঙের কাজটি একাডেমিক ধারায় তাঁর স্বভাবসিদ্ধতার পরিচায়ক। ভারতীয় পদ্ধতির বিভাগে শ্রীইন্দ্র দুগার, শ্রীঅবনী ঘোষ, শ্রীদ্বীপেন বসু, শ্রীরাধাচরণ বাগচী, শ্রীইন্দু রক্ষিত প্রমুখ শিল্পীদের প্রতিনিধিত্বমূলক নতুন কাজ রয়েছে। শ্রীঅন্নদা মুন্সীও তাঁর একটি কাজ প্রদর্শনীতে রেখেছেন।

জলরঙে 'গৃহাভিমুখী' ও 'শান্তির নীড়' ছবিদুটিতে শ্রীগোপাল ঘোষ তাঁর কোমল কবিত্বময়তায় অবতীর্ণ। এই বিভাগে শ্রীডি জে. যোশী, শ্রীমুরলিধর টালি, শ্রীপুলকরঞ্জন বিশ্বাস, শ্রীপ্রদীপকুমার বসু প্রমুখের কাজগুলি প্রশংসনীয়।

গ্রাফিক শিল্প গত কয় বছরে এক অগ্রসর মান অর্জন করেছে। শ্রীকৃষ্ণ রেড্ডী, শ্রীসোমনাথ হোড় প্রমুখের অবদান এজন্য নিঃসন্দেহে দায়ী। কিন্তু এবারের প্রদর্শনীতে তাঁদের ছবি দেখা গেল না। সাধারণভাবে বলতে হয়, প্রদর্শনীর গ্রাফিক বিভাগের মান কিন্তু মাঝামাঝির উপর ওঠেনি। উডকাটে নৃপেন্দ্রনাথ সেন, সান্ত্বনা গোস্বামীর মিশ্রপদ্ধতির কাজ, শ্রীমতী মার্গারেট ম্যাকেঞ্জী প্রমুখের কাজ উল্লেখযোগ্য।

ভাস্কর্য বিভাগটি সমৃদ্ধ। বিখ্যাত শ্রীরামকিঙ্কর এখানে উপস্থিত তাঁর সিমেন্টের কাজ 'কাক ও কোকিল' নিয়ে—প্রদর্শনীর বদ্ধকক্ষে নয়, মুক্ত

উত্থানশোভায় মনে হয় এই ভাস্কর্য কাজটির আপন স্থান। শ্রীসুনীল পালের 'বিবেকানন্দ'-এর আবক্ষ প্রতিমূর্তিটি বীর সন্ন্যাসীর এই শতবার্ষিকী বৎসরের যোগ্য স্মারক। শ্রীসুবল সাহা, শ্রীমাধব ভট্টাচার্য, শ্রীভোলানাথ কর্মকার, শ্রীসুবাস রায়, শ্রীহারান ঘোষ এবং শান্তিনিকেতনের শ্রীসুরেন দে প্রমুখের সিমেণ্ট, প্লাস্টার, কাঠ, ব্রোঞ্জ ও পোড়ামাটির কাজগুলি শিল্পানুরাগীর তৃপ্তি আনে। কিন্তু খ্যাতনামাদের মধ্যে শ্রীপ্রদোষ দাশগুপ্ত কেন অনুপস্থিত ?

এবারে প্রদর্শনীতে একাডেমি তরুণ শিল্পীদের যে সমাবেশ ঘটিয়েছেন, তার মধ্য দিয়ে এই সব শিল্পীর প্রতিশ্রুতিময় ভবিষ্যৎ প্রতিভাত হয়েছে। নাম করতে হয় শ্রীসজল রায়, শ্রীযোগেন ধিরাজ, শ্রীপূর্ণিমা গৌরীশ্বর, শ্রীবসন্ত অগসে, আর. কে. মলবঙ্কর, অরুণকুমার মুখার্জী, মঞ্জুশ্রী চন্দ, অরুন্ধতী রায় চৌধুরী প্রমুখের।

এ প্রসঙ্গে একাডেমির কর্তৃপক্ষের আরও একটি সময়োচিত উদ্যোগের উল্লেখ করতে হয়। গত নভেম্বরেই তাঁরা জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিলের জন্য ৯৬জন শিল্পীর এক প্রশংসনীয় প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিলেন। এ ছাড়া অনুষ্ঠিত হয়েছিল শিশুশিল্পীদের চিত্র প্রদর্শনী। ভবিষ্যতের এই শিশু প্রতিভারাও তাদের প্রদর্শনীর ছবির বিক্রয়লব্ধ অর্থ জাতীয় প্রতিরক্ষায় দান করে বয়স্কদের সঙ্গে এই জাতীয় সংকটে তাদের ভূমিকা পালনের সুযোগ লাভ করেছিল।

স্বরূপ গুপ্ত

পরিচয়, শান্তি ও পরমাণু সংখ্যা, ভাদ্র ১৩৬৯, প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। তারপর থেকে গত কয়েক মাসে অনেকে আমাদের কাছে এই সংখ্যাটির একটি কপি সংগ্রহ করে দেবার সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়েছেন। আমরা আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা করছি, অল্প কয়েকটি কপি সংগৃহীত হয়েছে। এখনো যাঁরা সংখ্যাটি পেতে চান তাঁদের অবিলম্বে তৎপর হতে অনুরোধ করছি।

সঙ্গীত প্রসঙ্গ

আধুনিক বাংলা গানের (১৯৪২-১৯৬২) আর্টের দিক ও জনপ্রিয়তা।

বিগত বিশ বছরের বাংলাদেশে সৃষ্টিধর্মী শিল্পের ক্ষেত্রে যে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেছে, বাংলা গানের স্থান তাদের মধ্যে বোধহয় অগ্রগণ্য। অথচ শিল্প ও সাহিত্যের অন্যান্য দিক নিয়ে যত মতবিভেদ, স্ব-স্ব ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ ও জ্ঞানী ব্যক্তিরা যত সচেতন হয়েছেন এবং মোটামুটি শিক্ষিত সমাজ উৎসাহী হবার যতটা প্রয়াস পেয়েছেন, বাংলা গান নিয়ে সুস্থ ও গঠনমূলক সমালোচনা সেই অনুপাতে প্রায় কিছুই হয়নি। সাম্প্রতিক কালের সাহিত্যের নতুন নতুন ধারা পাঠক সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, এই সম্পর্কে প্রণিধানযোগ্য আলোচনাও হয় জনপ্রিয় পত্রিকায়; চিত্রকলার ক্ষেত্রে চিত্রশিল্পীর স্বকীয়তা প্রমাণ করার সুযোগ আছে বিভিন্ন শিল্প ও সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিদের কাছে। উদাহরণস্বরূপ, চৌরঙ্গীর রাস্তায় চিত্রপ্রদর্শনীর কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। শ্রীপ্রকাশ কর্মকারের প্রচেষ্টা নিয়ে বিতর্কমূলক আলোচনা হয় ছাত্র বা বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে। আমি এমন লব্ধপ্রতিষ্ঠ বাঙালী কবিকে জানি, যিনি সাহিত্য, চিত্রকলা, পাশ্চাত্য সিম্ফনি, ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত নিয়ে বুদ্ধিবৃত্তির ব্যায়াম করেন অথচ আধুনিক বাংলা গান সম্পর্কীয় নিবন্ধ রচনা করায় কোনো গৌরববোধ করেন না। শিক্ষিত বা বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে যাঁরাও বা করেন তাঁরা রবীন্দ্রোত্তর যুগের বাংলা গানে পাশ্চাত্ত্য সুরের প্রভাব নিয়ে দু একটা রূঢ় উক্তি করে আধুনিক বাংলা গানের নিধনযজ্ঞের আয়োজন করেন। বিশদ ব্যাখ্যায় তাঁদের বক্তব্যের সহজ রূপ দাঁড়ায় এই যে পশ্চিমের সস্তা চটুল সুর আজ দৈনন্দিন জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতে বিধ্বস্ত মানুষের কাছে এক প্রচণ্ড প্রলোভন নিয়ে আসে যার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি বিকৃতরুচির অসুস্থতা ও তারই শিকারে উন্মার্গ শত সহস্র সাধারণ শ্রোতা। আধুনিক বাংলা গানের জনপ্রিয়তা দিনের পর দিন বাড়ছে এবং সকলেরই যে মানসিক সুস্থতার অভাব আছে এমন কথা সগর্বে কেই বা ঘোষণা করেন। আধুনিক বাংলা গানের বিপর্যয়ে যাঁরা শঙ্কিত হন বর্তমান লেখক পাশ্চাত্ত্য ও ভারতীয় সঙ্গীতের সাধারণ শিক্ষার্থী হিসেবে তাঁদেরই দলের অন্তর্ভুক্ত একথা বোধহয় প্রথমেই

বলে নেওয়া ভালো। আধুনিক বাংলা কবিতা, ছোটগল্প, উপন্যাস, চিত্রকলা সব কিছুরই সৌজাত্য আছে অথচ শিল্পের অন্যতম প্রধান অঙ্গ যে গান তার স্থান শিক্ষিত সমাজের বহুদূরে।

ভাষা ও সুর

বাংলা গানের প্রধান দুটি অঙ্গ, ভাষা ও সুর। আর একটু বিশদ ভাবে বলা যায় একটি তার কাব্যের দিক, অন্যটি সঙ্গীতের। আমাদের আলোচ্য বিশবছরের গান রচয়িতাদের ইতিহাস বুদ্ধিগ্রাহ্যভাবে লেখা নিঃসন্দেহে কঠিন। উত্তর-নজরুল কালের বাংলা গানের ধারা প্রধানত দু ভাগে বিভক্ত হয়ে যায় যার ফলে গানের মধ্যে সুরস্রষ্টা, কণ্ঠশিল্পী ছাড়া তৃতীয় ব্যক্তি প্রাধান্য লাভ করেন যিনি হলেন গীতিকার। প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রপ্রতিনিধির কাছে আধুনিক বাংলা গানের জনৈক বিশিষ্ট গীতিকার ও সুরকার ক্ষোভ প্রকাশ করেন যে বর্তমান বাংলা গানের জগতে গীতিকার ও সুরকার আলাদা ব্যক্তি হওয়ায় বাংলা গানে সুর ও ভাষার মধ্যে সমতারক্ষা করা যায় না। সৃজনশীল সমালোচনায় এমন মতামতের গুরুত্ব থাকলেও বাংলা গানের সামগ্রিক বিচারে এই সমস্যাই প্রধান হয়ে দাঁড়াবে এমন কোনো কারণ নেই। কেননা, তাহলে কণ্ঠশিল্পীর পক্ষেও অন্য রচকের গানের সুষ্ঠু প্রকাশে বাধা থেকে যাবে এবং তিনজনই একই ব্যক্তি হবেন এমন সৌভাগ্যের কথা না ভাবাই ভালো।

বাংলা গানের কাব্য বা লিরিক

বাংলা গানের কাব্য বা lyric নিয়ে প্রথমে আমাদের আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখব। গান যেদিন আধুনিকতার স্পর্শ পেল সেদিন তার ভাষা হল সহজ, কাব্যের আবেদনকে সর্বজনীন করার প্রয়াস মুখ্য হয়ে দেখা দিল গীতিকারদের মধ্যে। প্রসঙ্গত আধুনিক কবিতার বিপরীত ধর্মের কথা উল্লেখ করা পারে। যে কোনো শিল্পই যখন সর্বস্তরের মানুষের উপযোগী উপকরণ হয়ে কাজে লাগে তখন তার মধ্যে আর যাই থাক ভাবের গভীরতা থাকে কদাচিৎ। সকলকে শিল্প-সচেতন করা তখনই সম্ভব যখন জনসাধারণের শিক্ষার একটা সাধারণ মান থাকে। বাংলাদেশের মননশীল গীতিকাররাও তাই সহজ পথে জীবনবোধ প্রকাশ করার কাজে লাগলেন। আমাদের আলোচ্য যুগের প্রথম অংশে শ্রীঅজয় ভট্টাচার্যের মতো শক্তিশালী গীত-রচয়িতারা

সময়ে সময়ে সুরের দুর্বলতা ঢাকা দিয়েছেন কাব্যের মাধুর্য দিয়ে। জনপ্রিয়তা নিয়ে আলোচনা করলে একটি বিশেষ দিকে দৃষ্টি পড়ে। সে যুগে গীতিকারদের কোনো স্বতন্ত্র স্থান ছিল না সাধারণ শ্রোতাদের মাঝে। সর্বপ্রথম কণ্ঠশিল্পী এবং তারপরে যাঁর স্থান ছিল তিনি গানের সুরকার। বাংলাদেশের আধুনিক গানের শ্রোতারা গীতিকার ও সঙ্গীত-পরিচালক সম্পর্কে প্রথম সচেতন হলেন 'গাঁয়ের বধূ' জনপ্রিয় হবার সময়। কিন্তু সে আলোচনা এখানে নয়। তখনকার অনেক গানের কাব্যগত মূল্য ছিল না এমন নয়, কিন্তু কণ্ঠশিল্পীর জনপ্রিয়তা অন্যের খ্যাতি ও প্রতিভাকে অনেকাংশে গ্রাস করে। তাছাড়া আরো একটি প্রণিধানযোগ্য কারণ ছিল। বাংলা চলচ্চিত্র তখন এত প্রসার লাভ করেনি এবং চলচ্চিত্র সঙ্গীতের জনপ্রিয়তার প্রধান সহায়ক এতে বোধহয় সন্দেহের অবকাশ নেই। নজরুল-পরবর্তী গীতিকারদের ওপর পূর্বসূরীদের প্রভাব খুব নগণ্য। শ্রীপ্রণব রায় ও শ্রীঅজয় ভট্টাচার্যের কিছু কিছু গানের মধ্যে প্রতিভার আভাস ছিল তবে সে-কাব্য শুধু সুরের বাহন হয়ে জনগণের অন্তরে প্রবেশ করেছে। তাই স্বতন্ত্র মূল্য নিরূপণ করা দুরূহ হয়ে পড়ে। একটি বস্তু লক্ষণীয় এই-যে তখনকার গীতিকারদের গানের মূল ভাব ছিল প্রকৃতি বা প্রেম বা একসঙ্গে দুটোই। যেমন, চাঁদ চামেলি নিয়ে লেখা একাধিক জনপ্রিয় গান—

> "চাঁদ ভোলে নাই, চামেলিরে তাই,
> চামেলি ভোলেনি চাঁদে"

অথবা "কহিল চামেলি চাঁদেরে ডাকিয়া" প্রভৃতি।

এখানে স্মরণ রাখা কর্তব্য যে পাশ্চাত্যের বহু জনপ্রিয় গানের ভাষাও এইরকম প্রেম বা প্রকৃতিধর্মী এবং তার কাব্যগত মূল্য অত্যন্ত নগণ্য। যেমন শুবার্টের (Schubert) একাধিক পরিচিত গান। বিগত বিশ বছরের বাংলা গানে ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘ খুব উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের সঙ্গীত-রচয়িতারাই প্রথম ভাষার স্বাতন্ত্র্যের ওপর জোর দেন। তখনকার প্রচলিত ধারার মধ্যে শ্রীবিনয় রায়ের "সপ্তকোটি জনরঙ্গভূমি বঙ্গদেশ বীর প্রসবিনী" গান অভিনবত্বের সূচনা করে। শ্রীজ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের "এসো মুক্ত করো, মুক্ত করো অন্ধকারের এই দ্বার" কাব্যের বলিষ্ঠতায় উজ্জ্বল। এই সময়কার গানের সাহিত্যিক মূল্য থাকার প্রধান কারণ এই যে গীতিকারেরা বেশির ভাগই কবি। এখানে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো, শ্রীজ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের 'মধুবংশীর গলি' কবিতা।

শ্রীহেমাঙ্গ বিশ্বাসের "মাউন্টব্যাটন সাহেব হো!" শুধু সুর হিসেবেই চিত্তাকর্ষক নয়, ব্যঙ্গ কবিতায়ও এর অমেয় মূল্য আছে। দেশকে বিদেশী নাগপাশমুক্ত করার দৃঢ় সঙ্কল্প ও সুকান্ত ভট্টাচার্যের ভাষায়, এই পৃথিবীকে সকলের বাসযোগ্য করে তোলার আদর্শ এই সময়কার গানকে বলিষ্ঠ ও শক্তিশালী করে তুলেছে। তবে সাম্যবাদের আদর্শ সমস্ত গানের মূল ভাব হওয়ায় আবেদনে এই গান সর্বজনীন হয়ে উঠতে পারেনি। ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের মধ্যে শ্রীসলিল চৌধুরীই প্রথম জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন এবং তাঁর "কোন এক গায়ের বধূর কথা তোমায় শোনাই শোন" চতুর্দিকে আলোড়ন সৃষ্টি করে। বাংলাদেশের রেকর্ড সঙ্গীতের ইতিহাসে এ গান আজও অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে আছে। কিশোর কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের কবিতা সুরারোপিত হওয়ার দরুণও গানের জগতে ভাষার স্বতন্ত্র মূল্য প্রতিষ্ঠিত হলো। অপেক্ষাকৃত তরুণ সুরকারদের ওপর অবশ্য এর প্রভাব খুব সুখকর হয়নি। যেমন "রিক্সাওয়ালার গান" ও এই জাতীয় আরো কিছু নিকৃষ্ট রচনা। এই সময়ে আরো একটি স্মরণীয় রীতির প্রবর্তন হয়। প্রাচীন বাঙলা কবিদের কবিতাকে আধুনিক সুরকারেরা সুর সংযোজন করে আধুনিক বাংলা গানের জগতে নূতনত্বের সূচনা করেন। যেমন: মাইকেল মধুসূদন দত্ত, রজনীকান্ত, সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের বহুখ্যাত কবিতাগুলিকে সাম্প্রতিক কালের সুরের বাহন হিসেবে কাজে লাগানোর প্রয়াস। এই প্রচেষ্টা সকলক্ষেত্রে সফল হতে পারেনি। ঠিক এই সময়ের কিছু পর থেকে যে-রীতি বাংলা দেশের কাব্য বা লিরিকে চলে আসছে আজও সমান ভাবে তা অক্ষুণ্ণ আছে এবং ভাষার কিছু পরিবর্তন এখানে ওখানে চোখে পড়লেও মোটামুটিভাবে তাকে গ্রহণ করা যায় না।

শ্রীবিমলচন্দ্র ঘোষের গান:

"উজ্জল এক ঝাঁক পায়রা
সূর্যের উজ্জল রৌদ্রে
চঞ্চল পাখনায় উড়ছে,
নিঃসীম ঘননীল অম্বর
গ্রহতারা থাকে যদি থাক নীল শূন্যে
হে কাল হে গম্ভীর
অশান্ত সৃষ্টির প্রশান্ত মন্থর অবকাশ
হে অসীম উদাসীন বারোমাস।"

আধুনিক বাংলা গানের উৎকৃষ্ট ব্যতিক্রম। এখনকার গীতিকারেরা অধিকাংশই কবি না হওয়ার দরুণ বাংলা গান ক্রমশ অশ্রাব্য হয়ে উঠছে। এ উক্তি নিয়ে মতবিভেদ থাকার সুযোগ খুব কম। এর পক্ষে কিছু উদাহরণ দেওয়া প্রয়োজন।

"ও আমার মন যমুনার অঙ্গে অঙ্গে ভাবতরঙ্গে কতই খেলা।
বধূ কি তীরে বসে মধুর হেসে দেখবে শুধুই সারা বেলা,"

অথবা

"এই মেঘলা দিনে একলা ঘরে থাকে না যে মন
কবে যাব ফিরে পাব ওগো তোমার নিমন্ত্রণ,"

অথবা,

"এলো বরষা সহসা মনে তাই,
রিমঝিমঝিম রিমঝিমঝিম গান গেয়ে যাই,"

অথবা,

"আমার এ গানে স্বপ্ন যদি আনে
আঁখি পল্লব ছায়,
স্বপ্ন দেখে যাবো ছন্দ ভরা রাতে
তুমি আমি দুজনে"

প্রভৃতি অসংখ্য জনপ্রিয় গান বাংলাদেশের গানের বাজার সরগরম করে তোলে। এর মধ্যেও অবশ্য কয়েকটা অপেক্ষাকৃত ভালো গান স্বভাবতই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে:

"পথ হারাবো বলেই এবার পথে নেমেছি
সোজাপথের ধাঁধায় আমি অনেক ধেঁধেছি,"

অথবা,

"এবার আমি আমার থেকে আমাকে বাদ দিয়ে
অনেক কিছু জীবনে যোগ দিলাম,
ছোট যত আপন ছিল বাহির করে দিয়ে
ভুবনটারে আপন করে পেলাম,"

তবে অন্যান্য গানের ভিড়ে এর সংখ্যা খুব নগণ্য।

বাংলা গানের সুর

কাব্যের দিকে যা পরিবর্তন ঘটেছে তার দ্বিগুণ অভিনবত্ব এসেছে বাংলা গানের সুরের দিকে। সুরসাগর শ্রীহিমাংশু দত্তের নাম এই প্রসঙ্গে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। তাঁর সুরের যে ব্যঞ্জনা ছিল পরবর্তী গানে তার তুলনা মেলা ভার। ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের তাল লয়কে সহজ করে ভেঙে সুরকে স্বাধীন করে তোলার প্রয়াসে শ্রীদত্ত খুব কৃতিত্বের পরিচয় দেন। শ্রীকমল দাশগুপ্তও কিছু সুন্দর সুর সৃষ্টি করেন এবং তাঁর ওপর ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত ও গজল এই দুইয়ের প্রভাবই সমান ভাবে স্পষ্ট।

ঠুংরীকে আধুনিক গানের জগতে প্রতিষ্ঠা করে শ্রীসুধীরলাল চক্রবর্তী আমাদের শ্রদ্ধাভাজন হয়েছেন। তাঁর সুর প্রথম আমাদের আধুনিক বাংলা গানের উৎকর্ষ সম্পর্কে সচেতন করে। প্রবীণ সুরকার শ্রীঅনিল বাগচীও এই ধারায় প্রভাবিত হন এবং বাউলের সুরকে আধুনিক করে ব্যবহার করায় তাঁর গান প্রভূত জনপ্রিয় হয়। এই সময় থেকেই ভারতীয় গণনাট্যসঙ্ঘ বাংলা গানে বিভিন্ন দেশের সুরের অনুপ্রবেশ ঘটান। পাশ্চাত্য সঙ্গীতের সুর ও তাল এই সময় থেকেই আধুনিক বাংলা গানের মুখ্য অঙ্গ হয়ে পড়ে, যদিও শ্রীশচীনদেব বর্মণ আগে থেকেই এই প্রচেষ্টায় ব্রতী হয়েছিলেন। পাশ্চাত্য ও লোকসঙ্গীতের সংমিশ্রণে প্রথম জনপ্রিয় ও শিল্পোন্নত বাংলা গান সৃষ্টি করেন সলিল চৌধুরী। লোকসঙ্গীতের সহজরীতির সঙ্গে তিনি পাশ্চাত্য সঙ্গীতের সুর ও লয়ের মিলন ঘটান। এর সার্থক রূপায়ণ দেখতে পাওয়া যাবে 'রানার' ও 'পাল্কির গান'-এ। সাম্প্রতিক কালের গানের মধ্যে "কি যে করি দূরে যেতে হয়" ও "না যেও না, রজনী এখনো বাকী" এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। দুটো গানের প্রথমটায় গজ্‌লের সুর ও শেষেরটায় ঠুংরীর সুর। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে আবহসঙ্গীতে দুটো গানের ক্ষেত্রেই পাশ্চাত্য সিম্ফনির (symphony) সুর বাদ্যযন্ত্রে বাজানো হয়েছে। জনপ্রিয়তার দিক বাদ দিলেও অভিনব পরীক্ষার প্রচেষ্টা হিসেবে এর মূল্য চিরদিন থাকবে। শ্রীসুধীন দাশগুপ্ত ও শ্রীনচিকেতা ঘোষ এই ধারায় প্রভাবিত হন এবং কিছু সার্থক গান রচনা করেন। শ্রীরবীন চট্টোপাধ্যায় আধুনিক বাংলা গানের জনপ্রিয় সঙ্গীত-পরিচালক কিন্তু তাঁর মধ্যে স্বকীয়তার লক্ষণ খুব কম পরিলক্ষিত হয় যদিও দু-একটা সঙ্গীতে তিনি কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। শ্রীভূপেন হাজারিকা অসমীয়া লোকসঙ্গীতের সুর বাংলা গানে সংযোজন করায় কিছু শ্রুতিমধুর সুরের সৃষ্টি

হয়েছে তবে অধিকাংশ গানের কাব্য দুর্বল হওয়ায় গান হিসেবে শিল্পোন্নত হয়নি। আজকের চলমান বাংলা গানের জগতে শ্রীহারীন চট্টোপাধ্যায়ের সুরের একটা পরোক্ষ প্রভাব লক্ষ করা যায়। তাঁর একাধিক জনপ্রিয় হিন্দী সঙ্গীতের সঙ্গে যাঁরা পরিচিত আছেন, তাঁরা স্বভাবতই গণনাট্যসঙ্ঘের সুরকার-দের গানে এবং বিশেষ করে শ্রীসলিল চৌধুরীর সুরে এই প্রভাব লক্ষ্য করবেন।

বাংলা গানের ভবিষ্যৎ

কাব্য ও সুর এই দুই অঙ্গ নিয়ে রচিত বাংলা গান সম্পর্কে আলোচনা করলে সঙ্গীতানুরাগীদের বাংলা গানের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিরাশ হবার কারণ ঘটে। আধুনিক বাংলার শিল্প ও সাহিত্যের সর্বক্ষেত্রে আজ বিপর্যয় এসেছে, তাই বাংলা গানেও তার ব্যতিক্রম ঘটবে এমন আশা করা যায় না। তবে বাংলা গানকে উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে গঠনমূলক সমালোচনার (constructive criticism) প্রয়োজন আজকে সবচেয়ে বেশি। বাংলা গান নিয়ে যাঁরা আলোচনা করেন তাঁরা একথা প্রায়ই বলে থাকেন যে পাশ্চাত্যের রক এন রোল বা চা চা চা প্রভাবই বাংলা গানের দুর্দশার কারণ। তাঁদের সচেতন হওয়া উচিত যে কোনো সুরের প্রভাব গানে কিভাবে ব্যবহৃত হবে তা নির্ভর করে সুরস্রষ্টার প্রতিভার ওপর এবং একই সুরে একটি শিল্পোন্নত ও অপরটি নিকৃষ্ট গান সৃষ্টি হতে পারে। আমাদের দেশে রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল সকলেই পাশ্চাত্য সুর অনুপ্রবেশ করিয়েছেন বাংলা গানে এবং তার মধ্যে অনেক গান আজও বাঙালীর অন্তরে গাঁথা হয়ে আছে। অতুল-প্রসাদও যথেষ্ট নিষ্ঠার সঙ্গে পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য সঙ্গীতের মিলন ঘটিয়েছেন।

আজকের দিনে সঙ্গীত-উৎসাহী ব্যক্তিরা সুরের ক্ষেত্রে নূতন নূতন পথের ইঙ্গিত দেবেন, এবং বাংলা গানের কাব্যের দিককে উন্নত করার আদর্শে অনুপ্রাণিত হবেন প্রতিষ্ঠিত বাঙালী কবিরা, সেই আশা নিয়েই এই আলোচনার সূত্রপাত করা।

সুহাস চৌধুরী

নাট্য প্রসঙ্গ

লিটল থিয়েটার

গত আঠারোই জানুয়ারি সারা পৃথিবীব্যাপী স্ট্যানিস্লাভস্কির জন্মশতবার্ষিকী পালন করা হয়েছে। কলকাতায় লিটল থিয়েটার গ্রুপের উদ্যোগে ঐ একই দিনে মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে আধুনিক নাট্য ও মঞ্চভাবনার জন্মদাতা স্ট্যানিস্লাভস্কির জন্মশতবার্ষিকী পালন উপলক্ষে আলোচনানুষ্ঠানে বিশেষভাবে আমন্ত্রিত কলকাতার সোভিয়েত কনসাল জেনারেল স্ট্যানিস্লাভস্কি সম্পর্কে একটি হৃদয়গ্রাহী ভাষণ দেন। আলোচনা শুরু হবার পূর্বাহ্নে একশোটি মোমবাতি জ্বালিয়ে স্ট্যানিস্লাভস্কির জন্মশতবার্ষিকীর শুভ ঘোষণা করা হয়। শেষ মোমবাতিটি অনুষ্ঠানসূচী অনুযায়ী সোভিয়েত কনসাল জেনারেল স্বয়ং প্রজ্জ্বলিত করেন। শ্রীউৎপল দত্ত আধুনিক রুশ এবং জার্মান থিয়েটার সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন, স্ট্যানিস্লাভস্কির মঞ্চরীতি ব্যাপকভাবে অনুসৃত হলেও ব্যক্তির ইচ্ছা বা মত অনুযায়ী অন্যরীতি প্রয়োগ করার স্বাধীনতা সোভিয়েত ইউনিয়নে আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি মায়ারহোল্ড, অখলভ প্রমুখের নাম করেন। স্ট্যানিস্লাভস্কি যেখানে অভিনেতা এবং দর্শকদের মধ্যে একটি কল্পিত ব্যবধান টেনেছেন, যাকে স্ট্যানিস্লাভস্কীয় পরিভাষায় 'চতুর্থ প্রাচীর' বলা হয়, সেটি তাঁরই শিষ্য-প্রশিষ্যরা মানতে রাজী হন নি। স্ট্যানিস্লাভস্কির অভিনয়-রীতি অনুসারে অভিনেতা দর্শকের অস্তিত্ব সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে অতি সচেতনভাবে 'কাহিনীর বাস্তবে' প্রবেশ করবে। সার্থক অভিনয়-কলার গোপন ঐশ্বর্য এখানেই বিদ্যমান। মায়ারহোল্ড, অখলভ প্রমুখরা স্ট্যানিস্লাভস্কি কল্পিত 'চতুর্থ প্রাচীর' তো মানলেনই না, বরং অভিনেতারা যে অভিনয় করছেন তা 'কাহিনী, অভিনয়রীতি এবং মঞ্চ প্রয়োগ কৌশলে দর্শকদের মনে করিয়ে দিচ্ছেন'। বার্লিনের থিয়েটারপ্রসঙ্গে শ্রীদত্ত একটি উল্লেখযোগ্য তথ্য পরিবেশন করেন। জার্মান কবি নাট্যকার বের্টোল্ট ব্রেখটের নাট্যরীতি আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, যেহেতু ব্রেখট 'এপিক থিয়েটারে' বিশ্বাস করতেন, কাজে কাজেই তিনি স্ট্যানিস্লাভস্কি কল্পিত 'চতুর্থ প্রাচীর'কে সরাসরি অস্বীকার করলেন। মানবিক আবেগের বদলে তিনি মননের অমসৃণ সংলাপকে বেশি করে প্রশ্রয় দিলেন। মঞ্চকৌশলে

ব্যাপক পরিবর্তন ঘটালেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও স্ট্যানিস্লাভস্কির মৌল প্রভাবকে তিনিও অগ্রাহ্য করতে পারলেন না। নাটকের চরম সংঘাতমুহূর্তে অভিনেতাকে সেই চরিত্রের মধ্যে ডুব দিতে হয়ই, ভুলে যেতে হয় দর্শকের কথা।

স্টানিস্লাভস্কির মহত্ত্ব এইখানেই। অতঃপর শ্রীউৎপল দত্তের পরিচালনায় লিটল থিয়েটার গ্রুপের শিল্পিবৃন্দ কর্তৃক আন্তন চেখফের একটি গল্প অবলম্বনে রচিত 'বাজি' একাঙ্কিকাটি অভিনীত হয়। এ কথা প্রথমেই বলে রাখা ভালো পেশাদার রঙ্গমঞ্চে এখনও পর্যন্ত যদি কোনো দল শৌখীন নাট্যসংস্থার মনোভাব বজায় রেখে থাকেন, তাঁদের মধ্যে লিটল থিয়েটারের নাম সর্বাগ্রে উচ্চারণযোগ্য। লিটল থিয়েটারের প্রধান বৈশিষ্ট্য প্রকৃত বাস্তববাদী ধ্যান-ধারণা শিল্পকর্মে প্রয়োগ করা। খুঁটিনাটি বিশ্লেষণ এবং সূক্ষ্মবিচারের তারতম্যে অংশবিশেষ সমালোচনীয়। বর্তমানে এঁদের প্রযোজিত 'বাজি' একাঙ্কিকা দেখে কয়েকটি ভাবনা মনে উদয় হয়েছে। স্ট্যানিস্লাভস্কির প্রভাব মুক্ত হওয়ার ইচ্ছায় যে কটি নাট্যান্দোলন গড়ে উঠেছে, তাদের পরীক্ষা-নিরীক্ষার নির্বাচিত অভিজ্ঞতা শ্রীউৎপল দত্ত কাজে লাগাতে চান। প্রথমত প্রেক্ষাগৃহের মাঝবরাবর একটি বক্তাচরিত্রের আবির্ভাব ঘটিয়ে নাটকের মূলকাহিনীতে প্রয়োগ করানো, এবং প্রয়োজনমতো সেই একই চরিত্র, যাঁকে আমরা একজন বিশিষ্ট সাহিত্যিক হিসাবে চিনলাম, তাঁরই আত্মপরিচয় ভাষণে নাটকের চরিত্রের সঙ্গে দর্শকের যোগসূত্র বজায় রেখে চলছিলেন অনেকটা কথকঠাকুরের ঢঙে। নাটকের চরিত্রসমূহের অভিনয়, মঞ্চসজ্জা এবং বিশেষ করে সঙ্গীতের অভিনবত্ব স্বীকার্য। ইওরোপ এবং আমেরিকার দেশগুলির তুলনায়, এখানে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসাজাত পরীক্ষা-নিরীক্ষা খুবই স্বল্প। সেদিক থেকে শ্রীদত্তকে অভিনন্দিত করব। কিন্তু একথাও না-বলে পারছি না, নাটক দেখাকালে যে বিচিত্র জগতের মায়াজাল বোনা হয়, তাকে বারবার ভেঙে, আমরা নাটক দেখছি এটা জানিয়ে দেওয়ার কী সার্থকতা! শ্রীদত্তেরই উল্লেখিত ব্রেখ্‌ট রচিত 'দি ডেজ ইন্ দি কম্যুন' নাটকের পরিণতির কথা আমার একবার মনে পড়ছে। কেননা, অনেক সময় দেখা গেছে প্রয়োগ-রীতির 'অনিবার্য সাফল্যের' জন্য কাহিনীকে নাট্যরসের প্রাবল্যের দ্বারা মুহুর্মুহু আচ্ছন্ন করার মধ্যে অভিনেতৃদের উচ্চমানের অভিনয়কে পরোক্ষভাবে কিছু ক্ষুণ্ণ করে দেওয়া হয়। সঙ্গীতের অভিনবত্ব পরিবেশকে রোমাঞ্চিত করার মধ্যে যে সাফল্য খুঁজে পেয়েছে তা একান্তই বিদেশী চলচ্চিত্র তথা সাসপেন্স থ্রিলার (হিচকক্ জাতীয়)

মুখাপেক্ষী। সঙ্গীত পরিচালকের সংমিশ্রণের ক্ষমতাকে মর্যাদা দিই। 'বাজি' নাটিকার রূপায়ণে ছিলেন শ্রীসলিল ভট্টাচার্য, শ্রীসমরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীসত্য বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীঅরুণ রায়। প্রথম রজনীর অভিনয় হলেও প্রতিটি চরিত্রের বিশেষত উত্তীয়ের ভূমিকায় শ্রীসত্য বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মিহিরের রূপদানে শ্রীঅরুণ রায় যে ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন তা অধিকতর নিষ্ঠায় পরিণতির পূর্ণতা টানবে। নাটিকাটির পরিচালনা করেছেন শ্রীউৎপল দত্ত।

এ-ছাড়া সোভিয়েত দেশ কার্যালয়ে আর একটি ক্ষুদ্র অথচ মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ঐ সভায় বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং সংবাদপত্র ও পত্রিকার প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

রূপকারের 'তিলতর্পণ'

গত একুশে জানুয়ারি রঙমহল রঙ্গমঞ্চে রূপকার নাট্যগোষ্ঠী অমৃতলাল বসুর 'তিলতর্পণ' নাটকটি মঞ্চস্থ করেন। 'তিলতর্পণ' মূলত 'অপরিণত দর্শক' এবং সস্তায় বাজার মাত করার উদ্দেশ্যে যে সকল নাট্যসংস্থা নাট্যপ্রযোজনার ব্যাপারে এগিয়ে আসে তাদের, বিশেষত একটি যুগের বিশেষ একটি গোষ্ঠীকে, মুখ্যত আক্রমণ করে নাটকটির 'সাফল্যের' মূল কারণ হিসাবে বলছে,

"The Great
Farcial Tragi-Comedy-De-Pantomime
Operetta
for the first time in Indian Stage,"

এ-হেন নাটক দর্শক না দেখে থাকতে পারে না। কেন না এতে সবই আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা হয়েছে, 'Or the celebration of the Augustian celebration on the bank of mother Ganges with Til seeds in a copper plate to eat our fathers and fourteen generations." এক কথায় চৌদ্দপুরুষকে খুশি করা। এতে কী না আছে, 'scende, wing and Procenium in the Stage, Zoological show in the Stage, Singing, Dancing, Climbing, Jumping, throught on Music flowing in Cuprimic flow to conclude with nothing, when we laugh we lough with us."

সত্যি আমরা 'হেসেছি।' ইতর রসিকতায় আচ্ছন্ন শ্লীল-অশ্লীল মন্তব্যে, মার্জিত-রুকের এক অভূতপূর্ব সমন্বয়ে, তদুপরি নাটকের চরিত্রাবলীর ঐতিহাসিক অসংলগ্নতায়। স্ট্যানিস্লাভস্কির সমসাময়িক এই নাট্যকার অভিনেতা-দর্শকের ব্যবধান কি নিপুণভাবে ঘোচালেন তা স্বভাবতই মনে হয়। অভিনয়াংশে প্রতিটি চরিত্র সুঅভিনীত। সর্বাগ্রে শ্রীসবিতাব্রত দত্তর অভিনয় প্রশংসনীয়। তিনি একাই তিনটি চরিত্রের অভিনয় করেছেন সুন্দরভাবে। আবহসঙ্গীতে যুগের স্পন্দন পেয়েছি। মঞ্চসজ্জা এবং খুঁটিনাটি ডিটেলে সে-যুগটা পরিচালনার গুণে ফুটে উঠতে পেরেছে। তবে নাটকটির উপস্থাপনের মধ্যে কোনো সীরিয়াস শ্লেষ বা ইঙ্গিত না-থাকায় সচেতন পরিচালনার মৌল উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়েছে। দক্ষ পরিচালনা এবং সুঅভিনয় সত্ত্বেও মনে হয়েছে রূপকারের ইদানীং বিষয়বস্তু নির্বাচন এবং প্রয়োগ-রীতি স্বাভাবিকবাদের দ্বারা আক্রান্ত হতে চলেছে। সমসাময়িক জীবনের জীবন-জিজ্ঞাসাকে শিল্পজাত করা কি এঁদের পক্ষে সম্ভব নয়। আমরা বিশ্বাস করি না রূপকারের মতো শক্তিশালী নাট্যগোষ্ঠী তা করতে পারেন না। 'তিলতর্পণে'র অন্যান্য চরিত্রাংশে শ্রীপ্রদ্যোৎ চট্টোপাধ্যায়ের 'অজু', শ্রীমতী কালিন্দী সেনের 'রাণী', শ্রীমতী গীতা দত্তর 'হেমাঙ্গিনী' প্রভৃতির প্রাণবন্ত অভিনয় যথেষ্ট উপভোগ্য হয়েছিল। 'নাট্যকার' অতি অভিনয়ে দুষ্ট। 'সমালোচকে'র ভূমিকায় শ্রীসন্তোষ দত্তর অভিনয় স্মরণযোগ্য। রূপকারের পরবর্তী পদক্ষেপ সম্পর্কে আমরা আশান্বিত হতে চাই।

অলক চট্টোপাধ্যায়

সম্প্রতি পত্রপত্রিকার বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরিচয় নামধেয় একটি পাব্লিশার্স-এর কথা শোনা যায়। অনেকে এ-সম্পর্কে আমাদের কাছে অনুসন্ধানও করেন বলে জানাতে হচ্ছে—ওই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে 'পরিচয়'-এর কোনো সম্পর্ক নেই।

রবার্ট লী ফ্রস্ট

খুবই অল্পকালের ব্যবধানে কয়েকজন মার্কিন শিল্পসাধকের মৃত্যু হলো। বয়সের ভারে ন্যুব্জ কিন্তু আত্মার মহিমায় ভাস্বর জীবনদরদী মার্কিন কবি রবার্ট লী ফ্রস্ট গত ২৯শে জানুয়ারী লোকান্তরিত হয়েছেন। মৃত্যুকালে তাঁর আটাশি বছর বয়স হয়েছিল।

রবার্ট ফ্রস্টের নাম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উত্তরপূর্ব প্রদেশ নিউ ইংলণ্ডের সঙ্গে সমগৌরবে উচ্চারিত হয়। ১৮৭৪ সালে ক্যালিফার্নিয়ায় তাঁর জন্ম, পিতার মৃত্যুর পর মায়ের সঙ্গে তিনি তাঁর সাতপুরুষের বাসভূমি নিউ ইংলণ্ডে বাস করতে আসেন।

নিউ ইংলণ্ডের প্রকৃতি, তার তুষারবিস্তারী অরণ্য প্রদেশ, গাথা ও উপকাহিনী কিশোর ফ্রস্টকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। বস্তুত নিউ ইংলণ্ডের প্রকৃতিই কবি রবার্ট ফ্রস্টের কবিতার মূল বিষয়বস্তু।

নানা কারণে ফ্রস্টের জীবন ঘটনাবহুল। ডার্টস্মাউথ এবং হারভার্ডে তিনি অধ্যয়ন করেও কোনও ডিগ্রি নেন নি। মুচির কাজ, সাংবাদিকতা, শিক্ষকতা, চাষআবাদ প্রভৃতি নানাবিধ কাজ তাঁকে অন্নসংস্থানের জন্য করতে হয়েছে। ১৮৯৫ সালে বিবাহিত এবং ১৯৩৮ সালে বিপত্নীক ফ্রস্টের শিল্পজীবনে খ্যাতি আসতে যথেষ্ট দেরি হয়েছে। ১৯১২ সালে নিউ ইংলণ্ডের খামারবাড়ি বিক্রী করে ফ্রস্ট সপরিবারে ইংলণ্ডে সংসার পাততে এলেন। ১৯১৩ সালে ইংলণ্ডে প্রকাশিত তাঁর 'এ বয়েজ উইল' আটলান্টিকের দুই পাড়ে তাঁর খ্যাতি বয়ে আনে। ১৯১৪ সালে প্রকাশিত 'নর্থ অব বস্টন' তাঁকে মার্কিন দেশে প্রখ্যাত করে তোলে। ফ্রস্ট অতঃপর নিউ হ্যাম্পশায়ারে একটি খামার কিনে বসবাস শুরু করেন।

পরবর্তী জীবনে ফ্রস্ট বহুবিধ সম্মান ও পুরস্কার পেয়েছেন, তাদের মধ্যে বহু সম্মানী-ডক্টরেট উপাধি, এবং চারবার পুলিট্জার পুরস্কারলাভ অন্যতম। মৃত্যুর মাত্র কয়েকদিন পূর্বে ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাঁকে জীবিত মার্কিন কবিদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কবি বলে সম্মানিত করে বলিন্‌জান পুরস্কার দেয়। পোয়েট্রি সোসাইটির স্বর্ণপদক ছাড়া তিনি লাইব্রেরী অব কন্‌গ্রেসের কবিতা-বিষয়ক উপদেষ্টার সম্মানও পেয়েছিলেন।

সহজ, সরল এবং প্রাত্যহিক কথোপকথনের ভঙ্গিতে তাঁর শিল্পশৈলী চিহ্নিত, অমিত্রাক্ষরে নাটকীয় ব্যক্তিসংলাপের মধ্য দিয়ে তিনি নিউ ইংলণ্ডের প্রকৃতির—অরণ্য, জীবন ও তুষারপাতের বহুবিধ প্রতীকে অন্তর রূপটি ফুটিয়ে তুলেছিলেন। তাঁর নিকটে সকল বস্তুই যেন ব্রহ্মাণ্ডের পরম ঐক্যবিধান কার্যের

অসীম ব্যঞ্জনার অবশ্য অংশমাত্র! শব্দের চটকদারীতে, ভঙ্গির চমকে তিনি সাময়িকতার উচ্চরবে নিজেকে মেলাতে চান নি। যন্ত্রশিল্পাশ্রয়ী মার্কিন জীবনযাত্রার মূষিক প্রতিযোগিতার অন্যকোটিতে, অন্য এক জীবনবিশ্বাসী জীবনপ্রেমিক মার্কিন জগতের তিনি সন্ধান দিয়েছেন। গ্রামে বরফপাতের চিত্রটি, একক বৃক্ষশাখায় পাখিটির তুহিনবিস্তারী নিসর্গে নির্জনতা অনুভব প্রভৃতি চিত্রভাত হয়ে মার্কিন শিল্পচিন্তার অন্য একটি দান্ত আত্মস্থ পরিবেশ প্রদর্শিত করে। বৃদ্ধ বয়সে তিনি সোবিয়েত যুক্তরাজ্যে ভ্রমণে যান, সম্ভবত নিউ ইংলণ্ডের বার্চ গাছটির সঙ্গে কোনও সোভিয়েত জনপদপ্রান্তের রেলস্টেশনের পাশের বার্চ গাছটির মধ্যে তিনি কোনও বৈপরীত্যই খুঁজে পান নি। আপাত বৈপরীত্যের সুগভীরে যেখানে চিরায়ত জীবনপ্রবাহ, কবি রবার্ট ফ্রস্ট তার সংবাদই রাখতেন।

রবার্ট লী ফ্রস্টের কয়েকটি কবিতা

বিজনস্থলি

বরফ ঝরে, রাত্রি ঝরে—দ্রুত, কেমন দ্রুত,
মাঠের পথে চলতে গিয়ে দেখি,
মাটি যেন-বা ভরোভরো নিটোল তুহিনতায়
তবু অবশেষ বন্যঘাস, গুঁড়ি প্রকাশে, এ কি!

চতুর্দিকে বনে ঘেরাও, পেয়েছে তাকে, সে তো এখন ওদের
সর্বপ্রাণী আস্তানায় স্তব্ধ করে দিতে
আমি যেন-বা ভোলা ছিলাম সে সব গণনায়
একাকীত্ব আমাকে নেয় কখন অজানিতে।

নির্জনতা নিটোল, হেন বিজন চারিধার
ঘনিয়ে তোলে হায় সুবিজন···যা ঝরে যাবে পাছে
ব্যাপ্ত শাদা দিক্‌প্রসারী তুহিন নিশীথিনী
অনুচ্চারে স্তব্ধ, কিছু বলার নাহি আছে।

আমাকে ভীত করে না ওরা শূন্য অবকাশে
তারায় তারায় শূন্যতা—নাই তারায় নরনারী
আমারও মাঝে সে সব রয় গহিনে, সুগভীরে
ভয় দেখায় আমাকে নিজ বিজন আপনারি॥

বনের পাশে বরফে

এই বনরাজি কার, আমি যেন জানি
যদিও-বা গ্রামে গৃহখানি আছে তার
এখানে দাঁড়ায়ে সে আমারে দেখিবে না
বনে দেখিবারে বরফের বিস্তার।

আমার ছোট্ট ঘোড়া মানে বিস্ময়
না-থামায় কোনো খামারবাড়ির পাশে
বনরাজি আর বরফ জমাট হ্রদে
সারা বছরের কালো রাত নেমে আসে।

জিনের ঘণ্টা দোলা দেয় শুধাবারে
যেন সে, বুঝি-বা হলো ভুলচুক পিছে
কেবল অন্য স্বণণ বহিয়া যায়
সরল হাওয়া, ও তুষার ঝরার নীচে।

সুমদির বন, সুকৃষ্ণ সুগভীর।
বহু কথা দেওয়া আছে, মনে সব জাগে
যেতে হবে ঢের মাইল ঘুমের আগে
যেতে হবে ঢের মাইল ঘুমের আগে॥

আমার বাতায়নের পাশের গাছটি

বাতায়নধারে গাছ, জানলার গাছ,
আমার ঘরের শার্সি নামাই ছায়া বিস্তারী যামে
তবু যেন কোন যবনিকা আর কভু না মধ্যে নামে—
তোমার আমার মাঝ।

মাটি বেয়ে উঠেছিল অস্ফুট স্বপ্নের উদ্ভাস
বিস্তৃত হয়ে ছড়ায়ে রয়েছো মেঘের নিকটতর,
আলো ছলোছলো রসনা, তোমার সকল কলস্বর
হয়না প্রগাঢ় ভাষ।

তবু গাছ, আমি দেখেছি তোমায় উত্তাল হতে বায়
আর যদি তুমি আমাকেও দেখ যবে নিদ্রিত রই
কেমন আবেশ গভীর প্লাবনে ভেসে যাওয়া থই থই
সকল হারায়ে যায়।

সেদিন রমণী আমাদের শির এক করে রেখে যায়
ভাগ্য আছিল মোহিনীর দিকে প্রত্যাশে অনিমিখে :
—তোমার ললাট উদ্যত রয় অতি বাহিরের দিকে
আমার রয়েছে অন্তরে, আবহাওয়ায়॥

অননুসরিত পথ

দুটি পথ যায় দুদিকে, হলুদ বন,
দুঃখিত, যাই কেমনে দুপথে চলে
একক পথিক, দাঁড়াই অনেকক্ষণ
দেখি পথ এক—যত যায় দু-নয়ন
যেখানে সে পথ বাঁক নেয় তৃণদলে ;

আর পথ ধরি, সমসুন্দরই লাগে
মনে হয় যেন অধিক সে দাবীদার
কেননা সে পথে ঘাস বেশি, ক্ষয় মাগে
যদিও সে পথ বহু গতায়াতে আগে
পায় যথার্থ প্রায় সমক্ষয়ভার,

সমানই প্রভাত শায়িত বক্ষ পরে
পদচিহ্নের কালিহীন পাতা রাশি,
আহা প্রথমটি রাখি আর-দিন তরে
তবু মনে রাখি পথ টানে পথই ধরে
সন্দেহ মানি—যদি নাই ফিরে আসি।

শোনাবো একথা দীর্ঘনিশ্বাসে নামি
কোথাও আজের বহু বহু যুগ পরে :
দুটি পথ গেল দুদিকে, এবং আমি—
স্বল্প চরণচিহ্ন পন্থগামী—
আর তাই দিল সব বিপরীত করে॥

তরুণ সান্যাল

সম্পাদকীয়

রুদ্রের দক্ষিণ মুখ

মাথার উপরে যখন আকাশ ভেঙে পড়ছে এ অবস্থা, আজি সম্ভবত মানুষের মাথা খারাপ না করার দরকার বেশি। অবশ্য সাধারণ মানুষ প্রায়ই তা পারেন না। কিন্তু সেই সঙ্কটমুহূর্তে সমাজের বুদ্ধিজীবীরাও যদি বুদ্ধির সঙ্গে কর্তব্যের স্থির সম্মেলন ঘটাতে বিমুখ হন তাহলে তাঁরা যা করেন তার নাম আত্মনাশ, হয়তো আত্মপ্রবঞ্চনাও। সমাজেরও তা দুর্ভাগ্য, আর সামাজিক বিচারেও সে কাজকেই বলা যায় La Trahison de clerk. ভারতবর্ষের ও বাঙলা দেশের বুদ্ধিজীবীরা অনেকবারের মতো আবার এই পরীক্ষারই সম্মুখীন হয়েছেন চীনা আক্রমণের ফলে ও তার বিপর্যয়ে। পরীক্ষা রাজনীতির ও সামরিক শক্তিরও বটে, কিন্তু প্রধান পরীক্ষা জাতীয় সংহতির, সংগঠন শক্তির ও প্রবুদ্ধ চেতনার। সেইখানেই বুদ্ধিজীবীর আজ সাধনা।

নানা কারণেই দেখা গিয়েছে বুদ্ধিজীবীও আজ বড় অসহায়। প্রকাশ ও প্রচারেই যাদের অস্তিত্ব সেই বুদ্ধিজীবী সাংবাদিকরা আজ ভাগ্যভারেও খর্বিত—তাঁরা আর স্বাধীন নন। বুদ্ধির স্বাধীনতার জন্য 'কলম' যাঁরা সাজান, বুদ্ধির স্বাধীনতার জন্য কলম ধরা তাঁদের অসাধ্য। আমাদের বিশ্বাস, সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক প্রভৃতি কোনো কোনো বুদ্ধিজীবীর পক্ষে এরূপ অবকাশ এখনো বিলুপ্ত নয়; দায়িত্বপালন তাঁদের অনেকের পক্ষে সম্ভব। অন্তত বাঙলা দেশের সাহিত্যিকদের সে ঐতিহ্য আছে। মহৎ আমাদের সৌভাগ্য—আমাদের সম্মুখে চিরজাগ্রত রবীন্দ্রনাথ।

রবীন্দ্রনাথ যে কত জাগ্রত তা শান্তিনিকেতনের বার্ষিক উৎসবে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর অভিভাষণ থেকে আর-একবার আমরা অনুভব করলাম। এবং ঠিক রবীন্দ্র-বাণীরই বাঙালী উত্তর-সাধকদের জন্য অপেক্ষা করতে করতে যখন সংশয়িত হয়ে উঠছিলাম তখনি পত্রান্তরে দেখলাম—শান্তিনিকেতনস্থিত শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্কর রায়ের সুদীর্ঘ পত্র 'যোগভ্রষ্ট'। তাঁর মত, তাঁর বক্তব্য, সম্পূর্ণ তাঁর নিজস্ব; তাঁর চিন্তাভাবনার তা দান। সে সম্পর্কে মতান্তর থাকতে পারে। কিন্তু যে চিত্তস্থৈর্যের, শুভবুদ্ধির ও শুভ্র আন্তরিকতার পরিচয় তাতে পাওয়া যায়, নিশ্চয়ই প্রত্যেক বুদ্ধিজীবীর তা কাম্য। এই শ্রেয়ঃবোধই বাঙালী সাহিত্যিকের আপন ধর্ম, তার ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার। আর

একবার বুঝলাম—রবীন্দ্রনাথ জাগ্রত। রুদ্রের দক্ষিণ মুখ আমাদের নিকট তিনি উন্মোচিত করে রেখেছেন।

রবীন্দ্রনাথের সেই রুদ্র সাধনা বাঙালী সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীদের বুদ্ধির নিয়মে ও সৃষ্টির সংকল্পে সংযুক্ত করবে, এ আশা আমরা পোষণ করি। তার ব্যতিক্রম অবশ্য আজ কম দেখছি না; কিন্তু ব্যতিক্রমটাই সমগ্র সত্য নয়। সাংবাদিকতার কথা বাদ দিয়ে গদ্যে পদ্যে সাহিত্যিকদের উন্মাদনার যে পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে, তাতে অপেক্ষা করে থাকব—সবটা একেবারে স্থূল বাগাড়ম্বরে বা মেদমজ্জাহীন ভাবালুতায় নিঃশেষ হবে না। সৃষ্টির ফুল ফুটবে, বুদ্ধির ফসলও লাভ হবে, কর্মের যোজনা হবে সুনিশ্চিত। যো নো বুদ্ধি শুভয়া যুনক্তু।

সংবাদপত্রের যুগান্তর

'যুগান্তর' সম্পাদক বন্ধুবর শ্রীযুক্ত বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে শেষ সাক্ষাৎ হয়েছে ছ' মাস পূর্বে মস্কোতে, আর সাক্ষাৎ এখনো হয় নি। তার পূর্বেই তাঁকে 'যুগান্তর'-সম্পাদক বলবার উপায় আর রইল না—সম্ভবত তাতে অনেকের পক্ষে যুগান্তর পড়বার প্রয়োজনও মিটে গেল। সকলের পক্ষে নিশ্চয়ই একথা খাটবে না। কারণ, সংবাদপত্রে সম্পাদকীয় লেখা এদেশের পাঠকের পক্ষে এখনো একেবারে নগণ্য নয়, কিন্তু ইতিমধ্যেই তা গৌণ হতে শুরু করেছে। সংবাদই প্রথম পাঠ্য, এবং সংবাদ অপেক্ষা 'বিসম্বাদে'ই রুচি গঠিত। বলা বাহুল্য, ঐজন্যই 'বার্তা-সম্পাদকরা' 'কর্তা-সম্পাদকের' পরেই অধিক-গ্রাহ্য। উপরতলার রাজা-উজীরের দরবারে যান কর্তা-সম্পাদক আর তারপরেই স্থানীয় 'কালচারের ফাংশনে' পৌরোহিত্য করেন বার্তা-সম্পাদক—যাঁর 'ভাষণ' উপলক্ষ করেই ফাংশনকারীদের নামটা তাই পত্রস্থ হবার সুযোগ থাকে। এ যুগে লিখিয়ে সম্পাদক তাই 'এক্‌স্‌পেণ্ডেব্‌ল্' মাল সংবাদপত্রের মালিকদের খাতায়,—বিশেষ করে আবার সেই সম্পাদক যিনি নামে সম্পাদক বলেই মনে করেন সংবাদ-সাজানো আর মতামত গুছানোও বুঝি তাঁর এক্তিয়ার। কালধর্মে, অর্থাৎ 'সংবাদপত্রের স্বাধীনতার' নিজস্ব নিয়মে তাই 'যুগান্তরে'র সুদীর্ঘকালীন সম্পাদক সেই পথেই এক সন্ধ্যায় খারিজ হয়ে গেলেন যে পথে খারিজ হয়ে গিয়েছিলেন তাঁর গুরু স্বর্গীয় সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার—'আনন্দ বাজার পত্রিকা' থেকে।

অবশ্য সত্যেন্দ্রনাথের পর্বের পরেও আর একটা পর্ব এখন সমাগত।

রেডিও-টেলিভিশন প্রভৃতি যে দরিদ্র দেশে ততটা প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি, সে দেশে সংবাদপত্রই হচ্ছে সাধারণের মুখ্য চালক। একদিকে তাই এদেশে শাসক-গোষ্ঠী এগিয়ে এসেছেন বার্তাজীবীদের প্রতি দক্ষিণ হস্ত বাড়িয়ে —আইন করে তাঁরা সাংবাদিকদের দক্ষিণার সুব্যবস্থা করে দিচ্ছেন। আর স্বভাবতই তাই তাঁরা চান বেতন-ভোগী সাংবাদিকেরাও হবেন শাসনে তাঁদের সকৃতজ্ঞ অনুচর। কিন্তু দেশ চালায় কে? কুকুরে ল্যাজ নাড়ে, না, ল্যাজ নাড়ে কুকুরকে? এর উত্তর চীন-আক্রমণের মুখে বিড়লা-গোয়েঙ্কা-থেকে বাজারীয়ারা সকলেই নিজ নিজ সংবাদপত্রের মারফৎ সেদিনও পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুকে অবহিত করে দিয়েছেন। বিবেকানন্দবাবুরও তা আরও একটু বেশি বোঝা উচিত ছিল। কারণ, ইতিপূর্বেই অন্যদিকে তো তিনি দেখেছিলেন—পত্রমালিকের বাম হস্ত শাসকের আইনকে ভোঁতা করে সাংবাদিকদের বুঝিয়ে দিয়েছে দাক্ষিণ্যের এক্তিয়ার শাসকের নয়, মালিকেরই সম্পূর্ণরূপে, বেতনভোগী মাত্রই বেতন-দাস। দ্বিতীয়ত তাঁরই চোখের উপর দিয়ে তিনি দেখেছেন—সত্যেন্দ্রনাথের শূন্য আসনে যিনি আসীন হয়েছিলেন চপলা লক্ষ্মী তাঁকেও বিসর্জন না দিয়ে ছাড়লেন না। সরকার নির্দিষ্ট সম্পাদকীয় দক্ষিণার হার লেখক-সম্পাদকদের পক্ষে কাল হয়েছে। মালিক-সম্পাদকের স্ব-রাজ্যাভিষেক তা নিয়ম করে তুলেছে। এককালে সম্পাদকদের লেখাপড়া জানতে হতো, লোকমত গঠন করতে হতো, মালিক-সম্পাদকদের জানতে হয় মালিক-রাজ্যের 'হারেম-পলিটিক্স্', ম্যানেজ করতে হয় মুনাফার যন্ত্রপাতি, কলকব্জা। সংবাদপত্রের বর্তমানে এই পর্বই সমাগত।

পূর্ব অর্জিত অভিজ্ঞতাকে বিনষ্ট না করে বিবেকানন্দবাবু 'বসুমতী'র সম্পাদক-পদ গ্রহণ করেছেন এবার মালিক-গোষ্ঠীরও একজন হয়ে। তাতে মতামত পরিবর্জন বা পরিবর্তন আবশ্যিক নয়, অন্তত তাঁর জীবিতকাল পর্যন্ত তিনি সম্পাদকীয় নামের ও মতের অভিন্নতা রক্ষা করে হাতের নোয়া বাঁচিয়ে যেতে পারলে তিনিও সুখী হবেন, আমরাও হব। এবং হয়তো বাঙলা দেশের সংবাদপত্রের বিষ-চক্রের বাইরেও বাঙালী সংবাদপত্র পাঠকের শ্বাসগ্রহণের মতো একটু স্থান থাকবে। এই বিদায়-আশীর্বাদ দৃঢ়তার সঙ্গেই গ্রহণ করে বিবেকানন্দবাবু অগ্রসর হয়েছেন দেখে, আমরা তাঁকে অভিনন্দিত করছি। অভিনন্দিত করুক বাঙলা সংবাদপত্রের পাঠকশ্রেণীরা, এই আমাদের কামনা।

কিন্তু সেই সঙ্গেই অবহিত না হয়ে উপায় নেই—সংবাদপত্রে সম্পাদকীয় মর্যাদার ঐতিহ্য এদেশে বিলীনপ্রায়। পূর্বসূরীদের নাম করে আশ্বাস লাভের কোনো কারণ নেই।

সংবাদপত্র পাঠে এখন প্রত্যেক পাঠকেরই অনেক বেশি সতর্ক, অনেক বেশি সন্দিগ্ধ এবং অনেক বেশি অশ্রদ্ধাপর না হয়ে উপায় নেই।

গোপাল হালদার

দাম: এক টাকা



পরিচয়

ফাল্গুন ১৩৬৯